শ্রীমতী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক :
প্রকাশচন্দ্র সিংহ
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
জিতেন্দ্র নাথ বসু
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া
৩।১ মোহনবাগান লেন
কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

পরিবেশক :
ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

দাম : চার টাকা

প্রায় পঁচিশ বছর আগে
আমার কৈশোরের প্রথম-প্রথম
যাঁকে
আমিই প্রথম
আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী
বলে
প্রণাম করেছিলাম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচরণেষু

॥ রচনাকাল ॥

এপ্রিল—নভেম্বর ঃ ১৯৬০

পুরী ঃ কলকাতা

এক

আজ এ বাড়িতে আমার শেষ রাত !

আমার ঘুম আসবে না। একটি একটি করে সব আলো নিভে গেছে। কেউ জেগে নেই। মধ্যরাত্রির দুঃসহ চঞ্চলতা আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে।

আমি জেগে থাকব।

আমার জন্যে জ্যোৎস্নার রুপালি রেখায় রেখায় কাঁপছে কঠিন সঙ্গীত রাগের মতো মধুময় এক জাগরণ! হাওয়ার কম্পমান তরঙ্গে ভেসে আসা লোকাতীত অনুরণন আমাকে জাগিয়ে রাখে!

আমার চোখের তারায় তারায় থরোথরো মহাজীবন! হে রাজপুত্র! আমি তোমার শরণ নিলাম!

সে-রাজপ্রাসাদ সুপ্তির ক্লান্তিতে নিঝুম। রাজকীয় আড়ম্বর তোমাকে বাঁধতে পারবে না! শান্ত মন্থর চরণধ্বনি আলোর কণিকা জড়িয়ে জড়িয়ে নিবিড় আনন্দের গহনলোকে মিলিয়ে যাবে।

গোপা! তুমি ঘুমোও।

মা! তুমি ঘুমোও!

বাবা! তুমি ঘুমোও!

কিন্তু আমি আজ সারা রাত জেগে থাকব। জাগরণের কী বিপুল আনন্দ! প্রাসাদ লুপ্ত হয়ে যাক। ঐশ্বর্যের কঠিন শৃঙ্খল শিথিল হয়ে যাক। আমার হৃদয়ে আনন্দের বান। আমার নয়নে আনন্দলোক। আমার শ্রবণে শান্ত মন্থর চরণধ্বনি!

হে রাজপুত্র! আমি তোমার শরণ নিলাম!

হে মহাজীবন! আমি তোমার শরণ নিলাম!

দুই

এই কলকাতাকেই সেদিন আমি অন্য চোখে দেখেছিলাম।

যেন প্রথম দেখলাম। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তখন অনেক আলো জ্বলে উঠেছে। সাদা সাদা রঙ করা বড় বড় তালগাছগুলো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে সন সন শব্দ করছে। আর একটু এগিয়ে পুলিসের হাতের ইশারায় এক-একটা মোটর থমকে দাঁড়াচ্ছে।

রাস্তায় নেমে আমরাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমরা মানে সনতের তিন বন্ধু, সনৎ আর আমি। আজ থেকে আমি সনতের স্ত্রী। এখন আমার নাম শ্রীমতী মুখার্জি নয়—শ্রীমতী সিংহ। একটু আগে সামনের ওই পুরনো বড় বাড়িটার দোতলার ছোট একটা ঘরে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। একটা মোটা খাতায় বর কনে আর সাক্ষীদের শুধু কয়েকটা সই।

আপনারা বিশ্বাস করুন, এক মুহূর্তের জন্যেও আমার বুকের কাঁপন দ্রুত হয় নি। সামান্য উত্তেজনার কোন শিহর আমি অনুভব করিনি। ঠিক বিকেল পাঁচটায় প্রথম বৈশাখের প্রখর রোদে প্রৌঢ় ম্যারেজ অফিসারের নির্দেশমত আমি দু-একটা সই করে দিলাম।

আমার পূর্ব পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেল। এখন আমি নতুন সংসারের মানুষ। সনতের বন্ধুরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে সেই কথাটা হালকা সুরে শুনিয়ে দিল।

হাসির মৃদু একটা ঝলক দেয়া ছাড়া তখন আমার আর কিছু করবার ছিল না। অনেকদিন থেকেই আমি জানতাম আজকের এই ব্যাপারটা এমনি সহজ রূপ নিয়ে আমার কাছে গভীর হয়ে উঠবে। আমি ইচ্ছে করেই সনৎকে বেছে নিয়েছি।

ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও, আমার

মা-বাবার কাছে শুধু অস্বাভাবিক নয়, ভয়ঙ্কর রকম অপমানকর মনে হয়েছে।

অসবর্ণ বিবাহ বলে নয়, আমার মা-বাবা ওসব তুচ্ছ কারণ নিয়ে মাথা ঘামান না। আমি যদি সনৎ সিংহকে বিবাহ না করে অন্য কারুর সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে ফেলতাম—আর সে যদি এমন মানুষ হত যে আমার বাবার মত অতবড় চাকরি না করলেও মা-বাবার দৃষ্টিতে ভদ্ররকমের কোন চাকরি করে আর যার সংসারের মানুষরা আমাদের বাড়ির ধরনেই চলাফেরা করে, তাহলে আমার বুদ্ধি আর বিচারের ওপর মা বারবার অমন কঠোর উক্তি করতেন না।

কিন্তু মা এ কথাও জানতেন যে আমাকে বাধা দেবার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। আর সনতের বেলায় তিনি যেন নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন। আমাকে উপলক্ষ করে আর পাঁচজন আমার মা-র আসল রূপটা দেখে ফেলল।

কিন্তু আশ্চর্য, এখন মা-র কোন লজ্জা নেই। দুদিন আগে যে সনতের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন—আমার সঙ্গে মধুর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শুনেই তাঁর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল।

আমি মাকে কিছু বলিনি। কোনদিন বলতামও না। মা-র সঙ্গে যেন আমার ঈর্ষার সম্পর্ক। আমি মাকে স্বীকার করতে পারতাম না বলে আমার ওপর তাঁর ভয়ঙ্কর একটা আক্রোশ ছিল।

স্বীকার করবার কথাটা আপনাদের আরও স্পষ্ট করে বলি। মা হিসেবে তাঁকে মানি বা না-মানি, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তিনি যে আমার মা, সে-কথাটা তো কোনমতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু মা-র সাহিত্যিক সত্তা কখনও আমার মনে কোন রেখাপাত করেনি বলেই আমার ওপর তাঁর যত আক্রোশ। কেন রেখাপাত করেনি সে-কথাও আমি একে একে আপনাদের শোনাব।

আমি জানি না, আমার এ কাহিনী আপনাদের মনে কৌতূহল

জাগাবে কিনা। কিন্তু এই আমার প্রথম ও শেষ লেখা। এটা উপন্যাস না জীবনী, বড় গল্প না রম্যরচনা—তা আমি নিজেই জানি না বলে আপনাদেরও জানাতে পারলাম না।

আপনারা এর যা খুশি একটা নাম দিন।

শুনেছি নিজের জীবনের যে-কোন ঘটনার কথা লিখলেই তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। ফটোগ্রাফ হয়, কিন্তু শিল্পীর আঁকা ছবি হয় না। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার গাঢ় রঙ না মিশলে রসঘন কাহিনী ফুটিয়ে তোলাও নাকি সম্ভব নয়। পাতায় পাতায় অজস্র কথার ফাঁকে ফাঁকে চাই নিপুণ কারুকাজ। তা না হলে আজকের দিনে অসংখ্য গুণী লেখকের ভিড়ে আমার নাম পাঠক সাধারণের মনে কোন সাড়া জাগাবে না। আমার লেখাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তা যাক।

তাতে আমার এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। লেখিকা বলে বিখ্যাত হবার কোন মোহ আমার নেই।

একথা শুনে হয়তো আপনারা বলবেন, তাহলে লিখছ কেন? জানই যখন লিখে তোমার কিছু হবে না, তাহলে পাতার পর পাতা ভরিয়ে শুধু শুধু কেন সময় নষ্ট করলে?

কেন!

উত্তর একটা নিশ্চয়ই আমার মনে সাজানো আছে। কিন্তু আপাতত সে-কথা আপনাদের জানাবার ইচ্ছে নেই। শুধু এইটুকু বলে রাখি, মিথ্যার রঙ, কল্পনার তুলি আর ভাষার কারুকাজ সম্বল করে যে কাহিনী গড়ে ওঠে তার ওপর আমার নিজের খুব বেশি আস্থা নেই।

হোক অপটু হাতের অমার্জিত রচনা, কিন্তু তাতে যদি জীবনের স্পন্দন শোনা যায় আর আবিষ্কার করা যায় নির্মম এক সত্যকে গভীর সমবেদনার মধ্যে, তাহলে আমার মনে হয় সেই রচনা সাহিত্য

হিসেবে হয় তো সার্থক। কিন্তু আবার বলছি, আমার এ লেখা সাহিত্য হয়েছে কিনা সে-বিচার আপনারা করবেন না। আর কিছু থাক বা না থাক, এর প্রত্যেকটি পাতা আমি শুধু আমার নিবিড় উপলব্ধি দিয়ে ভরে দিয়েছি।

আর তাই আশ্চর্য এক প্রেরণার আভায় এ কাহিনী লেখবার সাহস পেলাম। আপনাদের পড়তে ভাল লাগুক বা না লাগুক, লিখতে আমার ভাল লাগছে। সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

আমার মা-র নাম সরমা আর বাবার নাম আদিনাথ। আর কোন ভাই-বোন নেই। আমিই একমাত্র মেয়ে।

বুদ্ধ-পূর্ণিমার রাতে আমার জন্ম হয়েছিল বলে আমার নাম শ্রীমতী। নামটা আমার মা রেখেছিলেন।

সে-কথাটা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রায়ই আমাকে শোনাতেন। অর্থাৎ আমার এই নাম রাখার পেছনে মা-র বিদ্যা-বুদ্ধির প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত আছে।

এমন নাম নাকি সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। যেহেতু আমার মা লেখিকা আর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি গভীর, তাই বুদ্ধ-পূর্ণিমার রাতে জন্মেছি বলে বুদ্ধের দাসীর অমন সুন্দর নাম তিনি আমার জন্যে ঠিক করতে পারলেন।

আমার মা-র নাম হয়তো আপনারা শোনেন নি। শোনবার কথাও নয়। কারণ তিনি যাঁদের নিয়ে থাকেন আর যে-সব চরিত্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে ভিড় করে দাঁড়ায়—আজকের দিনে সাহিত্যের দরবারে তাদের খুব বেশি মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না।

তবু আমার মা লেখিকা। সারা সকাল, সারা দুপুর তিনি লেখেন। লিখতে লিখতে তিনি গাছ দেখেন, পাখি দেখেন।

আমাদের বাড়িতে অনেক গাছ। অনেক পাখি। আমার মা বন-বাদাড় থেকে পাখি ধরে আনেন নি বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ির বাগানে তিনি অনেক গাছ পুঁতেছেন আর গেটের কাছে লম্বা লম্বা তালগাছের গায়ে অনেক খরচ করে সাদা রঙ লাগিয়েছেন। খুব সকালে ভোরের ভিজে আবছা আলোয় দূর থেকে দেখলে মনে হয় সারা রাত ধরে গাছগুলোর ওপর অঝোর তুষার ঝরেছে।

ভোর থেকেই আমাদের বাড়িতে অনেক পাখি ডাকে। দূর-দূরান্ত থেকে মাঝে মাঝে নানা রঙের অনেক পাখিও উড়ে আসে। সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর ওপর বাড়ি হলেও তখন মনে হয় না যে কলকাতায় আছি। একটা নকল পরিবেশ সৃষ্টি করে কলকাতায় অরণ্যের নির্জনতা নিয়ে আসার মূলে আমার মা।

মা-র সাহিত্যিক প্রতিভাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে বাবাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। কিন্তু তার জন্যে বাবা কখনও কিছু মনে করেন না। আমি অনেক সময় বুঝতে পারি না যতক্ষণ বাবা বাড়িতে থাকেন ততক্ষণ তিনি কেন ভয়ে ভয়ে এপাশে-ওপাশে ঘোরাঘুরি কবেন। সকালবেলা মা-র সঙ্গে কথা বলবার তাঁর সাহস হয় না। দরকার হলেও মা-র সামনে তাঁর দাঁড়ানো বারণ।

হ্যাঁ, আমার মা-ই বারণ করে দিয়েছেন! শুধু বাবাকে নয়—আমাকেও।

আমি কিন্তু অনেক সময় এ নিয়ম মানতাম না। তেমন প্রয়োজন হলে কোন কথা না ভেবে সোজা দোতলার ঘোরানো বারান্দায় চলে এসে মা-র সঙ্গে কথা বলতাম। তিনি বিরক্ত হচ্ছেন জেনেও আমার প্রয়োজন না ফুরোলে সেখান থেকে সরে আসতাম না।

আমার বাবা একটা বিলিতি কোম্পানির প্রায় সর্বময় কর্তা। হাজার তিনেকের কাছাকাছি মাইনে পান। বেয়ারা বাবুর্চি মোটর আর আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস সবই আমাদের বাড়িতে আছে।

আর সব ছাপিয়ে আছে একটা উগ্র বিলিতি গন্ধ—যার ঝাঁজে সব সময় আমি তীব্র অস্বস্তি অনুভব করতাম।

কিন্তু কেন করতাম ?

আমি ত এ বাড়িরই মেয়ে। আমার শৈশব থেকে যৌবনের প্রত্যেকটি দিন এখানেই কেটেছে। আমার মা-বাবার মত মানুষ আমি অনেক দেখেছি। আর যাদের সঙ্গে মিশেছি তারাও ঠিক আমাদেরই মত।

তাহলে কেন আমার এই সারা দিনরাতের অস্বস্তি ?

আমার মনের কোথায় একটা অদ্ভুত নিরাসক্তি বাসা বেঁধে আছে। ঐশ্বর্য আর উগ্র আলোর অহঙ্কার সেখানে পৌঁছয় না। যখন আমার আশে-পাশে আর কেউ থাকে না, বাড়ির সব আলো একে একে নিভে যায়, হাওয়ায় মন্থর ঝিমঝিমানি ভেসে আসে বেহালার ছড়ে কাঁপা-কাঁপা কান্নার মত তখন আমার মনে হয় যেন স্থুল মিথ্যার মাঝে আমি বাস করছি। এখানে আমাকে মানায় না। এমন করে বেঁচে থাকা আমার সাজে না।

আমার জন্মের সঙ্গে আমি যেন একটা কঠিন শর্ত বহন করে এনেছি। মুক্তির অদ্ভুত অলৌকিক এক শর্ত। আমি এমন করে বাঁচতে পারব না। প্রথম কৈশোরে অপরিণত ভাবনার ঢেউ আমাকে ইতিহাসের সেই চমকপ্রদ অধ্যায়ে বার বার টেনে নিয়ে যেত।

প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক সেই রাজপুত্র। রাজকীয় ভোগে যাঁর তৃপ্তি নেই। সম্পদে মোহ নেই। জরা আর শোক থেকে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করবার বাসনায় গহন নিশীথে যিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। আমি ত সেই বুদ্ধেরই পরিচারিকা। বিলাসের ঢেউ যে বাড়িতে সারা দিনরাত আছড়ে পড়ে সেখানে আমি থাকব কেমন করে!

অনেক রাত্তিরে যেদিন আকাশে স্থির ধোঁয়ার মত হাল্কা একটা

রেখা ফুটে উঠবে আর একটা লোকও জেগে থাকবে না কোথাও, গাছের পাতারা একটুও শব্দ করবে না, সেদিন মা-বাবাকে কিছু না বলে আমি বুদ্ধের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।

কিন্তু সে কবে ?

আমার মা যখন দামী দামী শাড়ি পরে বাড়িতে অতিথিদের অভ্যার্থনা করেন আর বাবা মদের ছোট গেলাসে আস্তে আস্তে চুমুক দেন আর বাড়ির সামনে অনেক বড় বড় গাড়ি দাঁড়ায়, তখন দিগন্তের একঝলক রঙ হঠাৎ যেন আমার সামনে সেই এক প্রশ্নই পাঠিয়ে দেয়, সে কবে ?

মা-র কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কিশোর বয়সে আমি অবুঝ মেয়ের মত ভয়ে ভয়ে অস্পষ্ট প্রশ্ন করতাম, সে কবে ?

আমাকে আদর করে মা হেসে জিজ্ঞেস করতেন, কি কবে রে ?

আমি চলে যাব ?

কোথায় যাবি রে ?

একদিন রাত্তিরবেলা ওই লেকের কাছে মন্দিরে। যেখানে ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজে আর অনেক সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়ে—আমি সেখানে কবে যাব মা ?

মা জোরে জোরে হাসতেন, সাধে তোর নাম শ্রীমতী দিয়েছি ! কী সুন্দর নাম !

আমি এখানে থাকব না। একদিন সকালে উঠে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। কিন্তু মা আমার জন্যে কখনও কাঁদবে না—

কথা শুনে মা-র মুখে করুণ একটা ছায়া নামত। আমার একটা হাত ধরে তিনি বলতেন, না, কোথাও যাবি না। এখন লেখাপড়া করতে হয়—কোথাও যাবার কথা ভাবতে হয় না।

আমি চুপ করে থাকতাম। বুঝতাম আমার চলে যাবার কথা মা-র ভাল লাগছে না। আর আমি তাঁকে কখনও কিছু বলব না।

যেদিন আমার ইচ্ছে হবে—যেদিন কিছুতেই আমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারব না, সেদিন পালিয়ে যাব—যেখানে ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজে সেখানে।

একদিন বিকেলবেলা আয়াকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে যাবার রাস্তাটা আমি ভাল করে চিনে আসব।

ঘর ছাড়ার এমনি ছাড়া-ছাড়া ধোঁয়াটে ভাবনা আস্তে আস্তে আমার কৈশোর পার করে দিল। আর তখন থেকেই মা বাবা আর আমার মাঝখানে বিরাট অমিলের একটা কঠিন প্রাচীর যেন আপনি গড়ে উঠল।

কলেজে ছাড়া আমি কোথাও যাই না। আমার কোন বন্ধুও নেই। আর সাজ-পোশাকের ভাবনা ভেবে আমি একেবারেই সময় নষ্ট করি না। মা অনেক চেষ্টা করেও সন্ধ্যার কোন পার্টিতে আমাকে কখনও নিয়ে যেতে পারেন না। আর তখন তাঁর সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয়।

লোকে কি ভাবে? মা বেশ উষ্ণস্বরে আমাকে বলেন, এমন বিশ্রী শাড়ি পরে তুই বাইরে বার হস—ছি!

আমার সাজতে ভাল লাগে না মা।

সাজতে তোকে কে বলছে? একটু ভদ্র বেশ করতে দোষ কি। কতরকম লোক আসে না আমাদের বাড়িতে?

আমি তো কারুর সামনে যাই না।

কেন? এমন সৃষ্টিছাড়া স্বভাব তোর হল কেমন করে?

আমি হেসে বলতাম, জানি না।

কিন্তু এমন করে তোর থাকা চলবে না, আমি বলে দিলাম। এবার থেকে আমি জোর করে তোকে আমাদের সঙ্গে পার্টিতে নিয়ে যাব—

জোর!

কথা শুনে আমি মনে মনে হাসতাম। আমাকে দিয়ে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ যে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারবে না, সে-বিষয়ে আমার একেবারেই সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঠিক এইসময়—কলেজে ভর্তি হওয়ায় প্রথম প্রথম মা-র সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঈর্ষারই হয়ে উঠল।

ঠিক আমাকে সাজাবার জন্যে মা যে খুব বেশি ব্যস্ত হতেন তা নয়, আমি বুঝতে পারতাম আমার বেশ-বাসের ওপর মারও প্রসাধনের মাত্রা নির্ভর করছে। আমি যদি সাদা সাধারণ শাড়ি পরে এখানে-ওখানে যাই, আর যোগিনীর মত সারাদিন দর্শনের বই-এ ডুবে থাকি, তাহলে যারা আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসে, সংস্কারমুক্ত অতি আধুনিক মানুষ হলেও তারা অবাক হয়ে মাকে আর আমাকে বারবার দেখে।

তাদের সেই দেখার মধ্যে আমার মা বোধহয় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের একটা সুর শুনতে পান। তাই তিনি আমাকে বকেন। আমাকে তাঁর মত করে তুলতে চান—যা আমি কোনদিনও হতে পারব না।

আমার মা কিন্তু লেখিকা।

খুব ভোরবেলা পাতলা শিশিরের ঘায়ে যখন আমাদের বাগানের ঘাস ভিজে থাকে আর দুধের গাড়ির রোগা লোকটা খিড়কির দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন নিচ থেকেও দেখা যায় আমার মা দোতলার ঘোরানো বারান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে দূরের গাছটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আলোর দীপ্তি তখনও প্রখর নয়। বাবা বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। বেয়ারা বাবুর্চি রান্নাঘরে সবে জটলা শুরু করেছে। বেয়ারার প্রথম কাজ হল মা-র পাশের ছোট টি-পয়ে কফির পট আর একটা কাপ পৌঁছে দেয়া। মা ইচ্ছেমত কফির কাপে চুমুক দেবেন আর লিখবেন।

আমি বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মাঝে মাঝে মাথা তুলে মাকে দেখি।

আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কেন তখন মাকে দেখলে আমার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা কাঁপে। আমার মনে হয় মা যেমনভাবে সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসে বসে লেখার কথা ভাবছেন, তেমন ভাবে লেখা যায় না। একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে নিজের দম্ভ বজায় রেখে বসে বসে গাছ-পাখি দেখলেই কি লেখা যায়!

কিন্তু সকালবেলা আমার সময় খুব কম। আমাকে সবই দেখতে হয়—সবই করতে হয়। বাবা যতক্ষণ না অফিসে বার হন ততক্ষণ আমি ছায়ার মত তাঁর পাশে পাশে ফিরি। বাবার অফিসে লাঞ্চ পাঠাবার ব্যবস্থা করে তবে আমি কলেজে বার হই।

কখনও কখনও অফিসে যাবার আগে কোন দরকারী জিনিস খুঁজে না পেলে বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমার কলমটা কোথায় রে?

আমি তো জানি না বাবা। মাকে জিজ্ঞেস করে আসব?

না না, কথা শুনে আমার বাবা যেন চমকে ওঠেন, ওঁকে এখন বিরক্ত করিস না—

কিন্তু কেন বিরক্ত করব না?

আমার কেমন একটা জেদ চেপে যায়। মা এখন সংসারের সব দায় এড়িয়ে যে কাজ করছেন তার কোন মূল্য আমি কিছুতেই দিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে দোতলার ঘোরানো বারান্দার দিকে এগিয়ে যাই। বাবা হয়তো বুঝতে পারেন না—বুঝতে পারলে বাধা দিতেন।

আমার পায়ের খস্ খস্ শব্দ শুনে মা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন যে আমি বারান্দায় এসেছি। কিন্তু তিনি মাথা তোলেন না। কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে যেমন লিখছিলেন তেমনি লিখে যান। আমিও চুপচাপ কিছুক্ষণ মা-র দিকে তাকিয়ে থাকি।

বাবার কলমটা দেখেছ মা?

এখনও তিনি মাথা তোলেন না। তাকিয়ে দেখেন না আমার দিকে।

অল্প হাওয়ায় দামী অর্কিডগুলো দুলছে। এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে মা-র পায়ের কাছে আর থেকে থেকে বড় আমগাছের ডালপালার মাঝ থেকে একটা পাখি ডেকে উঠছে।

মা!

এইবার আমার মা মাথা তোলেন। অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি। যেন তাঁর মনটা এখানে নেই। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন—কিন্তু আমাকে দেখছেন না। আশ্চর্য, মা-র এই দৃষ্টি আমার মনের মধ্যে কোন দাগ কাটে না।

বাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে মা। কলমটা কোথায় জান?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মা বলেন, তোকে আমি অনেকবার বারণ করেছি লেখবার সময় আমাকে বিরক্ত না করতে। তাহলে কেন তুই সময়ে-অসময়ে এখানে এসে হাজির হস?

বাবার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে—

আমি কি জানি কে কি কোথায় রেখেছে। যা এখান থেকে। আর কখনও এরকম করে এখানে আসবি না, বুঝলি?

আমার মা আবার মাথা নামিয়ে লেখায় মন দেবার ভান করেন।

ভান কথাটা আমি এখানে ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম। কারণ আমি বিশ্বাস করি না উত্তেজনায় দিশাহারা হবার পরমুহূর্তেই কোন মানুষ হৃদয়ের একটা সূক্ষ্ম বৃত্তিকে সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু এর পর মা-র সঙ্গে আর আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বলবার কিছু নেইও।

ঠিক এই সময়—মানে সকালবেলা আমার মা যখন লেখেন, তখন বাড়ির মধ্যে একটা সাংঘাতিক অঘটন ঘটে গেলেও মা লেখা ছেড়ে নিচে এসে একবারও জিজ্ঞেস করবেন না, কি হল?

কোন মানুষের দুঃখ-দৈন্য বিপদ-আপদ কিংবা অভাব-অনটনের চেয়ে এসময় মা-র কাছে লেখা অনেক বড়। আর হয়তো সেই কারণেই আমি আমার মা-র লেখায় গভীর কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারি না। আর আমার মনের কথা মা জানতেন বলেই আমার ওপর একটা বিরূপ ধারণা করে রেখেছিলেন।

একেবারেই স্পষ্ট ভাষায় আমাকে কিছু না বললেও মাঝে মাঝে মা-র কথায়-বার্তায় আমি বুঝতে পারতাম যে বাবার ওপর তাঁর কোন শ্রদ্ধা নেই।

কিন্তু সেটা মা-র মুখের কথাই।

শ্রদ্ধা থাক বা না থাক—এ বাড়ি আর পরিবেশের ওপর তাঁর আকর্ষণ যে অত্যন্ত গভীর সে-কথা তাঁর ভঙ্গিতেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠত।

হঠাৎ কোন-কোনদিন যেদিন ঘন ঘন পাখির ডাক আর কাঁপা-কাঁপা প্রথম ফাল্গুনের আলোয় আমার মা-র শৌখিন বিলাসী মন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠত, সেদিন তিনি আমাকে দেখতেন অনেকক্ষণ।

কেন দেখতেন সে-কথা আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। তারপর তিনি ভারী থমথমে গলায় আমাকে কাছে ডাকতেন।

মা-র এই ডাক শুনে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠতাম। তখন হয়তো আমার কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা যদি একবার তাঁর নতুন ভাবনার কথা আমাকে থেমে থেমে শোনাতে আরম্ভ করেন তাহলে আর সহজে থামবেন না। আর তাঁর কথার মাঝে আমার উঠে আসাও চলবে না।

আগেই বলেছি মা-র ভাবনা-চিন্তা আমার মনে ধরত না। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্লট শুনতে আমার কোন কৌতূহল জাগত না।

সেই এক পরিবেশ। একজন বড়লোকের ছেলে আর একজন বড়লোকের মেয়ে। কোথাও—কোন এক ড্রইংরুমে পাহাড়ে কিম্বা

সমুদ্রতীরে তাদের আলাপ। তারপর অনেক মান-অভিমানের অধ্যায় পার হয়ে, হয় তাদের বিচ্ছেদ, নয় বিয়ে।

যতই পাকা হাতের লেখা হোক না কেন, ঠিক এ ধরনের কাহিনী পড়তে কোনদিনই আমার ভাল লাগে না। দৈব-দুর্বিপাকে যদিও এ পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে, তাহলেও এ বাড়ির কারুর সঙ্গে আমি কোনদিনও আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন অনুভব করতে পারি না।

কেন যে পারি না, সে-কথা আমি আজকাল অল্প-অল্প বুঝতে পারি, কিন্তু স্পষ্ট করে প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই। এমন মনের অবস্থা নিয়ে বেশিদিন এ সংসারে বাস করা যায় না। আমি কি করব—কোথায় যাব—একটা সঠিক পথের সন্ধান আমাকে তখনও কেউ দিতে পারে নি।

যা হোক, অনেক সময় কাছে ডেকে মা কিন্তু আমাকে নতুন কোন কাহিনী শোনাতেন না। তিনি আমাকে দেখতেন আর দেখতে দেখতে নিজের মুখের ম্লান ছায়াটাকে আরও স্পষ্ট করে তুলতেন। আমি বুঝতাম, মা এবার এ বাড়ির বিরুদ্ধে আমাকে কিছু বলবেন।

তুই কি মনে করিস শ্রীমতী, ভিজে-ভিজে উদাস স্বরে মা আমাকে বলতেন, এ বাড়িতে এমনভাবে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে?

খারাপ লাগবে কেন মা?

তাহলে তোর কেন ভাল লাগে না?

এমন সহজ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর আমি মাকে হঠাৎ দিতে পারতাম না। তখন আমি মনে মনে অনেক বেড়ে উঠেছি। আসছে বছর আমার কলেজের পড়াও শেষ হয়ে যাবে। যদিও আমি খাতায়-কলমে দর্শনের ছাত্রী, তাহলেও অর্থনীতির দিকেই আমার ঝোঁকটা বেশি।

মাঝে মাঝে যখন আমি গাড়ি নিয়ে বার হই, তখন লেকের এলোমেলো হাওয়া আর টলমল কালো জল কিংবা ধু ধু ময়দানের

সবুজ ঘাস আর গঙ্গায় অনেক-সাগর-পেরিয়ে-আসা বিরাট বিরাট জাহাজের দেয়ালি-আলো আমার মনে কোন অনুরণন জাগায় না।

হয়তো এটা আমার স্বভাবেরই দোষ। কিন্তু কি করব বলুন? সত্যি কথা গোপন করতে পারব না বলেই তো এ কাহিনী লিখতে শুরু করেছি।

যদি কোথাও আত্মঘোষণার সুর কেঁপে ওঠে, তাহলে ক্ষমা করবেন—প্রচ্ছন্ন গর্বের আভা যদি কোন কথায় হঠাৎ ঝলসে ওঠে সে দোষও আমার নয়। আমি তো আমারই কথা লিখছি। দোষ-ত্রুটি-অহঙ্কার—এসব তো তার মধ্যে থাকবেই।

আসলে তখন প্রকৃতির অভাবনীয় দৃশ্য দেখবার চোখটাই আমার নষ্ট হয়ে গেছে। কোন অধ্যাপকের কাছ থেকে আমি পাঠ বুঝে নিই নি, কিন্তু আমার স্বতস্ফূর্ত চিন্তা দর্শন আর অর্থনীতি মিলিয়ে সারাদিন আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত যন্ত্রণার একটা সুর বাজিয়ে তোলে।

ফুটপাথে বসে থাকা অসংখ্য রোগা ছেলেমেয়ে, বাচ্চা কোলে নিয়ে ক্লান্ত শীর্ণ কত মা দু হাত বাড়িয়ে যেন আমাকে বলে, আমাদের দেখছ না কেন?

ছেলেবেলার একটা দৃশ্য আজও আমার মনে আছে। সেটা বোধহয় শীতকাল। আমাকে ইস্কুল থেকে তুলে নিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভার বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ একসময় গাড়ির গতি কমে এল।

মুখ বাড়িয়ে আমি দেখলাম, এক জায়গায় অনেক ভিড়—আর একটা ছোট ছেলে কোলে নিয়ে এক মা চিৎকার করে কাঁদছে। তার পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আর একজন লোক।

ও মা—মা, আমার কি সর্বনাশ হল গো! আমি কোথায় যাব গো!

ওর কি হয়েছে ড্রাইভার?

কী জানি, ওর দিকে শুধু একবার তাকিয়ে ড্রাইভার বলল, ওরা অমন করে কাঁদে দিদিমণি।

কেন কাঁদে ওরা ?

ভিক্ষে-টিক্ষে চায় বোধহয় !

কেউ দেয় না ?

কেউ কেউ দেয় বইকি।

তুমি এখুনি গাড়ি থামাও।

কেন ?

আমি জিজ্ঞেস করব ওর কি হয়েছে।

পাগল নাকি ? ড্রাইভার হেসে বলে, অমন কত লোক আছে কলকাতা শহরে—

না, তুমি গাড়ি থামাও। অত ভিড় কেন !

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বলে, মা বকলে আমি কি বলব ? যেখানে সেখানে এরকম করে দেরি করলে চলে নাকি দিদিমণি !

হ্যাঁ চলে, আমি প্রায় ছুটে সেই মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাই। বিরক্ত হয়ে ড্রাইভারও আসে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

রাস্তার দৃশ্য দেখে সেই প্রথম আমার মনে প্রবল একটা আঘাত লাগে। আজও মনে আছে বাড়ি ফিরে আমি কিছু খাইনি। মা আমাকে খাওয়াতে পারেন নি। বোধহয় সারারাত বিছানায় গড়িয়ে আমি কেঁদেছিলাম।

যে মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদছিল, আজ রাস্তায় তার স্বামী মারা গেছে। অনেক চেষ্টা করেও হাসপাতালে বেচারি জায়গা পায় নি। ছোট ছেলে নিয়ে মেয়েটি কোথায় যাবে ? তার যাবার কোন জায়গা নেই। আর ছেলের বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে কে ? তাদের যে চেনাশোনা কেউ নেই ! তাই অমন করে মেয়েটি কাঁদছে। কাঁদছে আর পেট-ঝোলা রোগা ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরছে।

আমার মুখে কথা নেই। আমার বুক ঠেলে কান্না আসছিল। ড্রাইভার যদি সেদিন জোর করে আমাকে গাড়িতে না তুলত, তাহলে হয়তো আমি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যেতাম। সেই অল্প বয়সে বারবার আমার মনে শুধু একটাই প্রশ্ন জাগত, কেন এমন হয়? আমি ওদের জন্যে কিছু করতে পারি না কেন!

তারপর এমন অনেক দৃশ্য অনেকবার দেখেছি। কেঁদেছি আর আস্তে আস্তে মা-বাবার ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভর করবার বিশ্বাসও আমার কমে গেছে। ওঁদের আমার বড় বেশি নিষ্ঠুর বলে মনে হত। কিন্তু ভাষা সাজিয়ে কোন কথাই ওদের বলবার সাহস হত না, আর কি বলব সে কথাও হঠাৎ ভেবে পেতাম না।

সেই বয়সে আমি তাঁদের কেমন করে বলব যে, তোমাদের আছে অসংখ্য ঘর—আর অনেকের ঘরই নেই। তোমাদের আছে প্রচুর খাবার—আর অনেকের আছে শুধু ক্ষুধা। তোমাদের কত রকম কাপড়ের স্তূপ—আর কত লোক শীতে কাঁপে।

আমি তোমাদের কেউ নই। নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তির মত তোমরা আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ। তোমাদের অনুভূতি বড় স্থূল। তোমরা নিজেদের ছাড়া আর কারুর কথাই ভাব না। আমি তোমাদের আমার আপনার লোক ভাবব কেমন করে।

কিন্তু মাকে এ ধরনের কোন কথাই আমি বলতে পারতাম না। বলতে ইচ্ছেও করত না। কারণ, শুধু কথায় রূঢ় আঘাত দিয়ে কোন লাভ নেই। যেন ভবিষ্যতে আমি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে মা-র প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।

আমাকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে যেন আপন মনেই মা আবার বলতেন, অনেক সময় এখানে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। মনে হয়, লতাপাতা ঘেরা কোন নির্জন কুটিরের ছায়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ি—যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না—জানবে না। সকলকে ছেড়ে আমি একেবারে একা থাকব—

কিছু একটা বলতে হবে বলেই আমি বলতাম, একা থাকতে চাও কেন মা?

একা থাকতে না পারলে শান্তিতে লেখা যায় না রে, হয়তো আমার মা অকারণেই একটু হাসতেন, এখানে অনেক কাজ, অনেক নিয়ম-কানুন—এখানে কি সারাদিন লেখা যায়!

তারপর এক সুরে আমাকে মা নিজের কথাই শোনাতেন, এমন করে বেঁচে থাকতে আমি চাই না রে। অভাবের মধ্যে বাস করে আমি নিজেকে চিনতে চাই। ছেলেবেলায় আমি ঠিক তোর মত ছিলাম। তাই তুই বোধহয় আমারই স্বভাব পেয়েছিস। কাপে কফি ঢালতে ঢালতে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, খাবি নাকি একটু?

না!

আজ তোর ক্লাস নেই?

সাড়ে এগারোটা থেকে!

কফির কাপে মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মা দু-এক পাতা লিখতেন। এক-একবার মাথা তুলে দেখতেন আমাকে। আমি উঠে যেতে চাইলেই বাধা দিয়ে বলতেন, বস।

মা আমার সঙ্গে কথা বলুন বা না বলুন, আমাকে বসে থাকতেই হবে। আমি চলে যেতে চাইলেই তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। মনে করবেন, আমি তাঁকে অবহেলা করছি।

এখন পাখির ডাক শোনা যায় না। একটু একটু গরম লাগছে। কাছাকাছি কোথাও ঘড়ি নেই। আমি বুঝতে পারছি না এখন ক'টা বেজেছে। বাবাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে বড় গাড়িটা ফিরে এল। মা এখন ওই গাড়ি নিয়ে মার্কেটে যাবেন কি না কে জানে। খুব বেশি দেরি হয়ে না গেলে আমি বাসেই কলেজ যাই।

এ নিয়েও মা-র কাছ থেকে আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়।

অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে মা তাঁর গোপন দুঃখ আমাকে জানাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ এ বাড়িতে হল না—সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ। যদি আমার বাবার মত মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে না হত, তাহলে নাকি জীবনটা তিনি একেবারেই অন্যরকম ভাবে গড়ে তুলতে পারতেন।

একটু ইতস্তত করে বাবার পক্ষ টেনে আমি বলতাম, কিন্তু তোমার কোন কাজে বাবা তো কখনও বাধা দেন না মা।

না, কফির খালি কাপটা সরিয়ে দিয়ে মা বলতেন, বাধা যেমন দেন না, তেমনি কোন উৎসাহ দেবার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

ইচ্ছে না থাকলেও আমাকে বলতে হত, কিন্তু হাজার অসুবিধা হলেও তিনি কখনও তোমাকে বিরক্ত করেন না।

দুই ঠোঁটের ফাঁকে কলমটা একটু ছুঁইয়ে মা বলতেন, শুধু নির্জনতা পেলেই জীবনকে মনের মত করে গড়ে তোলা যায় না। উৎসাহ দেয়া মানে কি? একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখা—এ-সংসারে যেমনভাবে দিন কাটাতে হয়, তেমন অবস্থায় আমার পক্ষে বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া খুবই শক্ত।

তুমি কি চাও মা?

আমি কি চাই? মা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতেন, সে-কথা আজ বলে আর লাভ কি, তিনি থামতেন। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতেন, তবে আমি কি চেয়েছিলাম জানিস?

কি?

এ বাড়িতে যা আছে আমি তার কিছুই চাই নি। এই আসবাব-আড়ম্বর, এমন বাড়ি আর বাগান, প্রত্যহের জাঁক-জমক কোনদিন আমার মনকে টানে নি—

হিম-হিম ভিজে সকালের ঠাণ্ডা আলোয় এমন কথা শোনবার সময় প্রথম প্রথম মা-র ওপর আমার গভীর সমবেদনা জাগত। তাঁর মধ্যে আমি যেন নিজেকে অনুভব করতে পারতাম।

কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকে মা বাবাকে এই প্রতিকূল পরিবেশের জন্য যখন দায়ী করতেন, তখন তাঁর কথায় আমি ঠিক সায় দিতে পারতাম না। এমন অবস্থায় বাস করবার জন্যে হয়ত বাবা একা দায়ী নন। কিন্তু কারা যে দায়ী, সে-কথা তখন বোঝবার মত বুদ্ধি আমার ছিল না।

এমন ভাবে আমি বাঁচতে চাই না, আমি কোন কথা না বললেও মা বলে যেতেন, তোর বাবা যেমন করে বেঁচে আছেন, সে বাঁচার সার্থকতা কোথায়! কে জানে তার নাম। তাকে শ্রদ্ধাই বা করে কে। লোকে কাজের জন্য তার কাছে আসে, আর কাজ শেষ হলেই চলে যায়। একদিন যখন তার ওই অফিসে কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে, তখন রাতারাতি নতুন লোক এসে বসবে তার জায়গায়। ভবিষ্যতে কে জানবে তার নাম!

অনেকের নামই তো লোকে জানে না, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলতাম, নামের মোহ না থাকাই ভাল।

তা না হয় না থাক, কিন্তু কাজের মোহ না থাকলে চলবে কেন? যারা তোর বাবার মত কাজ করে, তাদের ওপর কখনও আমার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। এ জীবন আমি চাইনি—চাইনি—চাইনি।

বেতের টেবিলের ওপর দুই হাত মুড়ে আমার মা যেন ভেঙে পড়তেন। কেন তার এ অস্বাভাবিক কান্না। যে যে জিনিস আমাদের বাড়িতে আছে, তার একটা না হলে মা-র যে সাংঘাতিক রকম অসুবিধা হবে, সে-কথা তাঁর চলাফেরা দেখেই আমি বুঝতে পারতাম।

সকালবেলা আমার যে মা এমন করে কাঁদতেন, কলেজ থেকে ফিরে বিকেলের চাপা আলোয় [illegible] হঠাৎ আমি তাঁকে

চিনতে পারতাম না। তখন আমি তাকিয়ে থাকতাম তাঁর দিকে—অনেকক্ষণ।

বয়সটা যেন হঠাৎ অনেক কমে গেছে মা-র। ঠোঁটে মুখে আর ভুরুতে দামী রঙের ছাপ। চুলের বিন্যাস করতেও অনেক সময় লেগেছে। পাতলা রঙীন একটা শাড়ি তাঁর শরীরটাকে টান-টান করে তুলেছে। আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মা বারবার দেখছেন। হাসি গোপন করবার জন্য আমি অন্যদিকে মুখ ফেরাতাম।

শ্রীমতী, যেন ভয়ে ভয়ে বলতেন আমার মা, একটা কথা শুনবি?

আমি জানতাম মা কি বলবেন। তবু অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, কি?

আজ আমাদের সঙ্গে ড্রইংরুমে থাকবি তুই—?

না।

কেন?

আমি দৃঢ়স্বরে বলতাম, কতবার তো বলেছি মা, আমার ভাল লাগে না।

আহা, আমারই কি ভাল লাগে? কিন্তু তোর বাবার জন্য আমাকে যে থাকতেই হয়—আর আমার জন্যে তুই না হয় রইলি—

সকালের প্রথম আলোয় ঘোরানো বারান্দায় একরাশ সাদা কাগজ সামনে নিয়ে যে মাকে আমি বসে থাকতে দেখেছি—আমার সেই মা-র সঙ্গে এই মা-র তফাৎ অনেক। ইনি যেন একেবারেই অন্যরকম। আর একজন কেউ। আমি কার ওপর বিশ্বাস রাখব!

আমি কেমন করে বিশ্বাস করব যে, সাহিত্যের জন্যে এ বাড়ির সব আরাম ছেড়ে বিকট দারিদ্র্যের মাঝে তিনি হাসিমুখে দিন

কাটাতে পারেন। যদি আমার মা-র অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থাকত, তাহলে এখানে থেকেই তিনি হয়তো সহজেই তাঁর প্রতিদিনের জীবনধারাকে একেবারে অন্যরকম করে তুলতে পারতেন।

তৈরি হয়ে নে। সকলের আসবার সময় হল—

না মা, আমার পড়াশুনো আছে।

একদিন লেখাপড়া না করলে কোন ক্ষতি হবে না তোর, মুখে আর একবার পাউডারের পাফ বুলিয়ে মা বলতেন, পরীক্ষার তো এখনও অনেক দেরি আছে—

রুক্ষস্বরে আমি বলতাম, পার্টিতে বসে বসে সময় নষ্ট করতে আমার ভাল লাগে না মা—কেন তুমি বারবার আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে বল? মাকে এড়াবার জন্যে কথা শেষ করেই সে ঘর থেকে আমি সরে যেতাম।

আর যেতে যেতে শুনতে পেতাম বিরক্তির তীব্র স্বর মা-র মুখ থেকে বেরিয়ে আসত, আশ্চর্য! এমন অদ্ভুত জেদী মেয়ে বোধহয় আর কোথাও নেই।

এই প্রথম নয়, মা আমার সম্বন্ধে এমন উক্তি বহুবার করেছেন। আর একটা কথা আমি কেমন করে আন্দাজে বুঝতে পারি যে, তিনি যতই আমার স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করুন—কোন ফল যে হবে না, সে-কথা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

তাই আমার ওপব তাঁর ঈর্ষাব ভাবটাও প্রবল হয়ে উঠেছে। সত্যি-মিথ্যা জানি না, হয়তো বয়সের একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে বলে তিনি মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর নিরাসক্ত মনের কাহিনী শোনান।

কিন্তু এমন সন্ধ্যেবেলায় আমার জন্য নষ্ট করবার মত বেশি সময় মা-র থাকে না। তিনি একটু বেশিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বারবার রান্নাঘরে যান। কথায় কথায় বেয়ারা-বাবুর্চিকে ডাকাডাকি করেন। বসবার ঘরটা ঢেলে নতুন করে সাজান।

আর বাবা ফিরে এলেই গর্বের হাসি-হাসি মুখ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কেমন হয়েছে ?

চমৎকার, বাবা হাতের কাছের ছোট ছাইদানে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলেন, তুমি একটু ছুঁলেই সব কিছুর চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়।

তাই নাকি ? আমার মা মুখ ফিরিয়ে হাসেন, তুমি কিন্তু ঠিক এক রকমই রয়ে গেলে।

কে বলে সে-কথা, বাবাও হাসেন মা-র একটু কাছে এগিয়ে এসে, এই দেখ না, একটু আগে বাইরে একেবারে অন্যরকম ছিলাম, কিন্তু এখন—

থাক থাক, ওপরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবেন আমার মা, মেয়েটার এবার একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

বাবা চমকে ওঠেন, কি হল ওর ?

কি জানি, স্বরে বিরক্তি মিশিয়ে মা বলেন, কেমন অদ্ভুত ধরনের অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। কারুর সঙ্গে মেশে না—কোথাও যেতে চায় না। এই বয়সে এমন করে দিন কাটানো কি ভাল ?

কোন বন্ধু-বান্ধব নেই ওর ?

মনে তো হয় না।

তাহলে ভাবনার কথা বটে, হাতের সিগারেট নিভিয়ে ফেলেন বাবা, চল, ওকে নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।

কতবার তো গেলাম কত জায়গায়। কি হল ?

তাহলে কি করা যায়, মা-র কথা শুনে বাবাকেও হঠাৎ যেন আমার ভাবনা পেয়ে বসে, ওর অনেকের সঙ্গে মেশা দরকার—অনেক মানুষ দেখা দরকার—

সে-কথা একবার ওকে বলে দেখ না।

বলব।

আমার মা-বাবার মধ্যে প্রায়ই আমাকে নিয়ে অনেক কথা হত। মাঝে মাঝে তাঁদের কথাবার্তার টুকরো আমার কানে আসত, আর কখনও কখনও তাঁরাই আমাকে আমার সম্বন্ধে তাঁদের অভিযোগের কথা জানাতেন। কিন্তু শেষের দিকে আমি বুঝতে পারতাম, মা যেন আমাকে একটু ভয়ও করতেন।

আর কথায় কথায় বারবার আমাকে বোঝাতেন যে, আমি যেমন করে লেখাপড়া আর নিজের স্বাধীন ভাবনা নিয়ে দিন কাটাই, তেমন করে দিন কাটাবার ইচ্ছে তাঁর নাকি ছোটবেলা থেকেই। তাহলে কেন তিনি আমাকে তাঁদের সান্ধ্য-আসরে নিয়ে যাবার জন্যে জোর করেন, আমি শুধু সে-কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারি না।

আমার ভাল লাগে না। বিকট একটা যন্ত্রণায় আমি ছটফট করি। প্রতি পদে হালকা লৌকিকতার চমক, জীবনকে সুলভ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা আর নির্লজ্জ অপচয়ের রূঢ় প্রকাশ আমাকে নিবিড় বেদনা দেয়। আমার মা-বাবার ওপর আমি শ্রদ্ধা হারাই।

পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর যখন তাঁরা আমার সামনে চলাফেরা করেন আর আমি তাঁদের শরীর থেকে বিলিতি মদের গন্ধ পাই, তখন—আপনাদের সত্যি বলতে বাধা নেই—এ পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল বলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার শরীরে ঘৃণার শিহরণ তোলে।

এই অশুচি পরিবেশে অন্ধের মত কিম্বা শিকল বাঁধা মূক এক জীবের মত আর কতদিন আমাকে কাটাতে হবে!

কবে মুক্তির বিপুল তরঙ্গ এসে এদের কবল থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে!

এখন আমি শুধু দিন গুনি। এখান থেকে আমার বিদায়ের দিন। এই নিষ্ঠুর স্বার্থপর পরিবেশ থেকে আমার মুক্তির দিন। হঠাৎ

একদিন দূর থেকে থেমে থেমে ভেসে আসা ঝঙ্কারের মত নিবিড় একটা ইঙ্গিত আমাকে আশ্বাস দেবে—সাহস দেবে। আর তখন এখানকার কোন কিছুই আমাকে টেনে রাখতে পারবে না। আমি গোপন ছায়ার মত সেই ইঙ্গিতের নির্দেশে এই নির্দয় পরিবেশ ছেড়ে এক মুহূর্তে সরে যাব।

কিন্তু আজ আমার মনে প্রশ্ন জাগে, কোথায় যাব? কে আমাকে ডাকবে? কে এগিয়ে আসবে আমার মনের কাছে—যে না বলতেই আমার এতদিনেব তিল তিল করে জমে ওঠা সব যন্ত্রণা অসহ নতুন এক উদ্দীপনার ছটায় ঢেকে দেবে।

আমি তাকে চিনি। তার প্রতীক্ষা করি। কিন্তু জানি না তার নাম। তবু সে আসবে। আসবেই। ঢেউএর মত। ঝড়ের মত। সূর্যমুখীর মত হঠাৎ একদিন সে ফুটে উঠবে আমার জীবনে।

শৈশব আর প্রথম কৈশোরের সে বাসনা আজ আমার ঘুচে গেছে। আজও আমি বৃদ্ধ মন্দিরের ঢং ঢং বাজনা শুনি, আর আমার মন অনেক—অনেক দূরে ভেসে যায়। কিন্তু আমি আজ মন্দিরে আশ্রয় নিতে চাই না—বাইরের একটা আশ্চর্য কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চাই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেখছি আবছায়া একটা আক্রোশ—স্পষ্ট চেতনার একটা রেখা আস্তে আস্তে আমার মনে গভীর হয়ে উঠছে। যখন আমার কাছাকাছি অসংখ্য শীর্ণ মানুষ ক্ষুধায় ছটফট করছে, দুঃখের বিপুল ভারে দেহ যাদের বেঁকে যাচ্ছে—তখন আমারই চোখের সামনে যদি দেখি অকারণ উৎসবে দিনের পর দিন একদল মানুষ শুধু সব কিছুর অপচয় করে যাচ্ছে, তাহলে তাদের হৃদয়হীন ছাড়া আমি আর কি আখ্যা দিতে পারি!

আমার মা-বাবা যেন অন্যের অন্ন কেড়ে খাচ্ছেন। নিজেদের স্বার্থপরতার জন্যে চারপাশে তাঁরাই অভাবের কঠিন জালটা তিলে

তিলে প্রসারিত করে চলেছেন। তাই আমার মা-বাবার বিরুদ্ধে মনে মনে আমি সারা জীবনের এক সংগ্রাম ঘোষণা করি।

আমার কাজ বাইরে—মন্দিরের ভেতর নয়। এখান থেকে আমি চলে যাব অন্য আর এক পরিবেশে, যেখানে স্বার্থপরতার এমন বীভৎস প্রকাশ নেই। এমন কোন ঘরেই আমি যাব, যেখানে দেয়ালে-দেয়ালে নিবিড় মমত্ববোধের স্পর্শ লেগে আছে।

আর এমন কোন কেউ—যাকে আমি অনুভব করি আমার বুকজোড়া যন্ত্রণার মাঝেও—সে থাকবে আমার সংগ্রামের অক্লান্ত সঙ্গী হয়ে। কিন্তু তাকে আমি কোথায় পাব? এমন জায়গায় সে আসে না—আসতে পারে না। তার গতিবিধি অন্য কোথাও —সেখানকার ঠিকানা আমি আজও পাই নি।

তবু আজ থেকে আমি তাকে খুঁজে ফিরব। এই প্রতিকূল পরিবেশে বাস করেও আমার প্রথম কাজ সেই হৃদয়বান মানুষের অনুসন্ধান। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে ওঠে। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বড় বড় গাছের ফাঁক থেকে অনেক পাখি ডেকে ওঠে। পাতার মৃদু মর্মরও আমি শুনতে পাই। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আলোর সরু রেখা আমার মুখের ওপর এসে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে।

তিন

মা-বাবা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার বিষণ্ণ দৃষ্টি, শ্লথ গতি আর কোলাহল-বিমুখতা বন্ধনের স্বাদ পেলেই দূর হয়ে যাবে—এই ধারণায় তাঁরা স্থির করলেন আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। আর এতদিন কেন সে-চেষ্টা করেন নি—সে-কথা ভেবে অনুতাপ করলেন।

আগেই বলেছি উগ্র আলোকরেখায় আমাদের বাড়ি উজ্জ্বল। আর আমার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের কোন বাধা নেই—আশা করি সে-কথা না বললেও চলে। মা-বাবা নিজেদের নিয়ে সব সময় এত বেশি ব্যস্ত যে, আমি কখন কি করলাম—কোথায় গেলাম—তা নিয়ে তাঁরা কোন কৌতূহল দেখাবেন না।

কিন্তু এবার আমার একজন সঙ্গীর সন্ধানে মা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর সে কি রকম হবে, তার বিশদ আলোচনা আমার সামনেই মা-বাবার মধ্যে হত। আমি এই ফাঁকে তাঁদের কাটা-কাটা সংলাপের কিছু কিছু আপনাদের শোনাই। মাঝে মাঝে কঠিন উত্তেজনার চাপে তাঁদেব কথার মাঝে আমার বলে উঠতে ইচ্ছে করত, না না না, এমন কাউকে আমি চাই না।

সবে বিলেত থেকে ফিরেছে এস ব্যানার্জির ছেলে—পাইপ দাঁতে চেপে বাবা বলতেন, তুমি মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে একদিন কথা বলে দেখ না—

কথায় ঝাঁজ ছিটিয়ে মা বাধা দিতেন, এস ব্যানার্জির ছেলে মানে? তুমি ওই অজিতের কথা বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

ছি ছি, ও তোমার মেয়েকে খাওয়াবে কি? এত বছর বিলেতে কাটিয়ে একটা চারশ টাকা মাইনের চাকরি জুটিয়ে ভারী বাহাদুরী

করেছে, তীক্ষ্ণস্বরে বিশেষণ প্রয়োগ করে মা বলতেন, ওয়ার্থলেস ফেলো!

বোকা-বোকা দৃষ্টিতে মা-র মুখের দিকে বাবা তাকাতেন, তুমি কারুর কথা ভেবেছ নাকি?

ডাক্তার রায়ের ভাইপো—

বলব নাকি ডাক্তার রায়কে?

ওঃ, ডোণ্ট বি সিলি! বাবার মতামতের যেন কোন দামই নেই, বুড়োদের এর মধ্যে টানবার দরকার কি! ছেলেকে একদিন সন্ধ্যেবেলা ডাকলেই তো হয়।

কি নাম যেন ছেলের?

কল্যাণাক্ষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইন বয়, অনেকক্ষণ চুপ করে বাবা পাইপ টানতেন, কিন্তু খুকি শেষ অবধি গোলমাল না করে!

কিসের গোলমাল?

যদি সামনে না আসে? মানে, ইফ সি ডাজন্ট্ লাইক হিম?

ও কি বোঝে লাইকিং-ডিসলাইকিং-এর? এমনভাবে আর বেশিদিন থাকলে মেয়েটা পাগল হয়ে যাবে, তা কিন্তু আমি তোমায় অনেকদিন আগে থেকেই বলে আসছি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মা গলা নামিয়ে বলতেন, আর, সি ইজ নট অ্যাট-অল চার্মিং—এত চেষ্টা করেও ওকে অ্যাকমপ্লিসড্ করতে পারলাম না। কল্যাণাক্ষ ওকে এড়িয়ে যায় কিনা আগে তাই দেখ।

তা হয় তো যাবে না, আমাকে টেনেই বাবা কথা বলতেন, খুকি যা রেজাল্ট করেছে পরীক্ষায়—

মা মুখ টিপে হাসতেন, ওসবের দাম ছেলেরা দেয় নাকি কখনও?

দেয় না? যতই রূপ থাক, আজকাল লেখাপড়া না-জানা মেয়ে এ-সব ছেলেরা ঘরে আনতে চায় নাকি?

রূপ আর বিদ্যা—তারা দুই-ই চায়। তোমার মেয়ের রঙের কথাটা ভুলে যেও না।

হাউএভার, বাবা বোধহয় একটু হাসতেন, এখন বিয়ের ব্যাপারটা ও কি ভাবে নেয় সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না, এক মিনিট থেমে মা বলতেন, যা বোঝাবার ওকে, আমিই বোঝাব।

দ্যাট্ আই নো।

আলোচনার এখানেই শেষ হত না। আরও অনেক ছেলের কথা তাঁরা তুলতেন। আমি যেমন পরিবারে জন্মেছি ঠিক তেমন অসংখ্য পরিবারের উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করতে বসতেন, সবচেয়ে বেশি উপার্জন কার। এবং প্রয়োজন হলে কাকে বড় চাকরি জুটিয়ে দিয়ে বাবা আমার জন্যে তাকে কৌশলে বেঁধে ফেলতে পারবেন কি-না।

আমার বিয়ের ব্যাপারে তাঁদের এমন চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করতে দেখে বিদ্রূপের একটা উদ্দাম তরঙ্গ আমার মনের মধ্যে ফেনিয়ে উঠত। মাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করত, কেন তুমি বারবার আমার কাছে নিজেকে ছোট প্রমাণ কর! কেন বল যে, এই সুখ-সম্পদ ছেড়ে শুধু তোমার সাহিত্য সম্বল করে অনিশ্চিতের মাঝে ঝাঁপ দিতে চাও।

তোমাদের সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। তোমরা যাকে আনবে—আমার চরিত্রে সে ক্ষীণ আলোর আঁচও লাগাতে পারবে না—আমার কোন পরিবর্তনই হবে না, সে-কথা যদি এখনও না বুঝে থাক, তাহলে যেদিন কল্যাণাক্ষকে তোমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কৌশলে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে, সেইদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।

কিন্তু শেষ অবধি কল্যাণাক্ষের সঙ্গে আমার দেখা হল না। হঠাৎ একদিন যাকে যত্ন করে নিয়ে আসা হল তার নাম বিজয়কেতন। মা-বাবা যদিও আমাকে কিছু বলেন নি, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম

যে, এর আয় আর সামাজিক পদমর্যাদা তাঁদের দৃষ্টিতে হয়তো সেই কল্যাণাক্ষের চেয়ে আরও অনেক বেশি। আজকাল এ বাড়ির মানুষের চলাফেরার মধ্যে আমি খুব সহজেই একটা অর্থ খুঁজে পাই।

একেবারে প্রথমেই আসল কথাটা মা কিন্তু আমার কাছে ভাঙলেন না। আমাকে কাছে ডেকে একথা-ওকথার পর বললেন, বিজয় কাল আসবে। কিছুদিন হল অ্যামেরিকা থেকে ফিরেছে। খুব বড় এঞ্জিনিয়ার—

আর একটা বাড়ি করছ নাকি মা? এঞ্জিনিয়ারের নাম শুনে সরল প্রশ্ন বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

বাড়ি? কই না তো!

তাহলে হঠাৎ এঞ্জিনিয়ার কেন?

মা হেসে উঠলেন, এমনি আসবে। তোর বাবার বন্ধুর ছেলে কিনা। ওকে খেতে বলেছি কাল।

আমি আস্তে বলি, ও।

তোকে কাল সারাদিন বাড়ি থাকতে হবে, হাতের কলমটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মা বলেন, এবার তো আর পার্টি-টার্টি নয়, বিজয় একাই আসবে—

কখন?

সন্ধ্যেবেলা। আর, অল্প হেসে মা বলেন, রাগ-রাগ মুখ করে এক কোণায় গম্ভীর হয়ে বসে থাকবি না। হাসবি। কথা বলবি।

আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাই, হ্যাঁ।

মা খুশি হয়ে বলেন, ও প্রায় তোরই সমবয়সী কিনা। আমাদের সঙ্গে বেশিক্ষণ আর কি কথা বলবে!

তুমি ওকে দেখেছ মা?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মা বললেন, খুব চমৎকার ছেলে বিজয়। ওর বাবার তিনটে গাড়ি। উনি বাইরে থাকেন, কলম

খুলে সাদা কাগজে একটা দাগ টেনে মা বলেন, আসানসোলে মা কোথায়—তবে শুনেছি শিগগিরই কলকাতায় বদলী হয়ে আসবেন, ভয়ে ভয়ে মা আমার মুখের দিকে তাকান।

কেন তিনি মাঝে মাঝে আমার দিকে এমন ভীত দৃষ্টি দেন আমি বুঝতে পারি না। এটা হয়তো তাঁর আমার কাছে সত্য গোপনের ভয়। আমি বুঝতে পারি যে, মা বিজয়কে কখনও দেখেন নি, আর তার বাবার নামও এর আগে কখনও শোনেন নি। কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন, কেন বিজয়কে বাবার বন্ধুর ছেলে বলে আমার কাছে পরিচয় দিলেন।

তার খবর তিনি এখান-ওখান থেকে সংগ্রহ করেছেন। এ বাড়ির অনুসন্ধানের ধারাও আমি জানি। ছেলের স্বভাব কেমন সে-কথা আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেও কখনও তাঁরা প্রথমে জানতে চাইবেন না। সবচেয়ে আগে জানবেন তার সঞ্চিত অর্থের খবর। তারপর তার আয় আর বংশের ইতিহাস।

এর মধ্যেও আরও একটা কথা আছে। শুধ্ যে অর্থ দিয়ে কেউ আমার মা-বাবার স্বীকৃতি পাবে, সে-কথাও ঠিক নয়, অলীক একটা আবরণ তার থাকা চাই।

আমার মা-বাবা সেই আবরণের নাম দেন কালচার। যেখানে গভীরতা নেই, ধ্যান সাধনার কোন ইঙ্গিত যেখানে কাঁপে না, শুধু আড়ম্বর হৃদয়াবেগে ঢেউ চূর্ণ করে দেয়, সেখানেই তাঁদের যাতায়াত।

কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার আত্মার পরিচয় হবে কেমন করে!

অন্য প্রসঙ্গ তুলে আলোচনার ধারা মা হঠাৎ ঘুরিয়ে দিলেন, তোর আরও পড়াশুনো করবার ইচ্ছে আছে নাকি?

নিশ্চয়ই।

তা কর, মা আমার খুব কাছে সরে আসতেন, কিন্তু এবার একটু শরীরের যত্ন নে।

আমার শরীর ভালই আছে মা।

কোথায় ভাল? বড় রোগা হয়ে গেছিস। চোখদুটো একেবারে বসে গেছে—

ও কিছু না।

যাক, কয়েক মুহূর্তের জন্যে মা থেমে থাকতেন, বিজয়কেতন এলে ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবি—

আমি হেসে বলতাম, কেন বলব না মা? আর তোমরা যখন বলছ সব দিক থেকে ও অদ্বিতীয়—

তুই কথা বলে দেখিস।

দেখব মা।

আর একটা কথা—

বল না!

কাল তোকে আমি যে শাড়ি বেছে দেব, সেটা পরতে হবে—আমি যেমন করে সাজিয়ে দেব, তেমন করে সাজতে হবে। খুকি, আমার একটা কথা শোন—

মা-র উদ্দেশ্য আমি অনেক আগেই যে বুঝেছিলাম, সে-কথা আপনাদের বলেছি। কিন্তু তাঁকে এখনও কিছু বুঝতে দিলাম না। শুধু আমার মুখে হালকা হাসি ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, মা যা বলবেন, আমি আজ তাতেই রাজী হয়ে যাব। এবার আমার কাজের মধ্যে দিয়ে ব্যবধানের রেখাটা প্রকট করে তুলব। এতদিন হয়ে গেল—আমি এত কথা বললাম—আমার প্রতি মুহূর্তের ভঙ্গিতে বাসনার ইঙ্গিত ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দিলাম, তবু সে-বাসনার রূপ এঁরা দেখলেন না।

এঁরা বুঝতে পারলেন না আমাকে। ভাবলেন, এ আমার ক্ষণিকের মানসিক বিকার। আস্তে আস্তে আমি তাঁদের মতই হয়ে উঠব—একদিন আমার সব পাগলামী দূর হয়ে যাবে।

মা-বাবার এই বদ্ধমূল ধারণা হয়তো এবার দূর হবে। বিজয়কে

নিয়ে তাঁরা কি করেন আমি দেখব। তাঁরা যা বলে যাবেন, একটা কাঠের পুতুলের মত আমি তাই করে যাব।

আর যখন সেই বিজয়কে উপলক্ষ করেই তাঁরা দেখবেন যে, সত্যি সব দিক দিয়েই আমি তাঁদের সমাজে একেবারেই বেমানান, তখন হয়তো আমাকে নিয়ে তাদের এমন কৌশলের পরিকল্পনার শেষ হবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার আরও একটা কথা আপনাদের না বলে পারছি না। মা-বাবা—বিশেষ করে মা আমার বিয়ের ভাবনায় মাঝে মাঝে একটু বেশিরকম অস্থির হয়ে উঠতেন। তাঁর অস্থিরতার প্রথম কারণ হল, আমার রঙ ফরসা নয়। দ্বিতীয়ত, আজকাল মা-বাবার দৃষ্টিতে যে ছেলেরা প্রথম শ্রেণীর, তাদের আয়ত্তে আনতে হলে যে গুণগুলির দরকার, তার কোনটাই আমার নেই।

আমি মানুষের সঙ্গে মিশতে জানি না। আধুনিক সমাজের কোন বিষয়েই আমার আকর্ষণ নেই। তাছাড়া, মা বলেন, রূপগুণ নেই বলে আমার একটুও আক্ষেপ নেই। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত রুক্ষ।

আমি কেমন করে মা-বাবার মনের মত প্রথম শ্রেণীর পাত্রকে মাতিয়ে তুলব!

কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, আমার রঙ উজ্জ্বল কি শ্যাম, দেহ সুঠাম কি শীর্ণ, আমি পুরুষ বশ করার ছলাকলার অধিকারিণী কিনা—এসব কথা ভেবে কোনদিনও নারীসুলভ কোন বৃত্তি আমার মনে প্রবল হয়ে ওঠেনি।

দ্রুত বেগবান যে ধারা আজকের সমাজের অজস্র মানুষকে একই দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—আমি তার বিপরীত দিকে চলতে চাই—সেই ধারাটার গতি প্রাণপণ শক্তিতে ঘুরিয়ে দিতে চাই। কিন্তু মাঝে মাঝে অনুভব করি, আমার একার সে-শক্তি নেই। তাই অন্য আর একজনের প্রতীক্ষা করি। যে ঠিক আমারই মত।

এই যন্ত্রণা অন্ধ আক্রোশে আমার ব্যক্তিগত মেয়েলী দম্ভকেও হার

মানিয়েছে। নিজের রূপগুণ নিয়ে গবেষণা করবার কোন ইচ্ছে জ্ঞান হবার পর থেকে বোধহয় আমার হয়নি। শৈশব থেকে আমার চিন্তা—যতদূর মনে পড়ে সমষ্টির জন্যে। আমার নিজের জন্যে নয়। বোধহয় কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্যেও নয়। আমার মনের এ খবর মা-র মত মানুষ রাখবেন কেমন করে।

মা মধুর কৌশল করে যেদিন বিজয়কেতনের সামনে আমাকে নিয়ে এলেন সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের এ সাক্ষাৎ শেষ নয়। এরপর মা আমাদের জোর করে ছবি দেখতে পাঠাবেন। নানাভাবে আমন্ত্রণের আয়োজন চলবে কতবার। আর দুজনকে কথা বলবার অবসর দিয়ে হঠাৎ একটা ছল করে তিনি সে ঘর থেকে উঠে যাবেন, সে-কথাও আমি জানতাম।

এতটা শুনে আপনারা আমাকে ধিক্কার দিতে পারেন। হয়তো বলবেন, তোমার ছলনা করা উচিত হয় নি। এটা তোমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদি তুমি বিজয়ের মত মানুষকে সত্যি স্বীকার করতে না পার, তাহলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ভান করলে কেন? তোমার মাকে সোজা সে-কথা বলে দিলেই তো পারতে। এমন রসিকতার একটা সুলভ বৃত্তি হঠাৎ তোমার মনে জেগে উঠলই বা কেন? তোমার ওপর আমাদের শ্রদ্ধা শিথিল হয়ে গেল যে।

এ-কথা আপনাদের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, সে-কথা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়ে আমি বলছি যে, মা যদি শুধু কথায় আমার মতামত বুঝতে না পারেন, তাহলে আমাকে কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁকে তার প্রমাণ তো দিতেই হবে।

তাছাড়া, রসিকতা করবার সাধ কার না হয় বলুন? আর সে সাধের মাত্রা মেয়েদের মনে একটু বেশি তো হবেই।

শুনেছি, বিজয় থেমে থেমে বলেছিল, পড়াশুনোর বাইরে যে বিপুল একটা জগৎ আছে, আপনি সে-খবর রাখেন না—

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, মা আপনাকে একটু ভুল বলেছেন। জগতের খবর আমি ঠিকই রাখি। তবে বর্তমান ধারাটার সঙ্গে শুধু তাল মেলাতে পারি না।

কেন?

হয়তো সে কথা আপনাকে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি গলার স্বর খুব নামিয়ে বলেছিলাম, আর তার প্রয়োজনও নেই।

বিজয়ের সেই এক প্রশ্ন, কেন?

কারণ, আমার চিন্তা যদি দশজনের মধ্যে সত্য হিসেবে ছড়িয়ে দিতে না পারি, তাহলে তা কাউকে বললে একটা ব্যক্তিগত বিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই হয় না।

কিন্তু, বিজয়ের দেশলাই খুব আস্তে ফস্ করে একটা মৃদু শব্দ করেছিল, একজন-একজন করে না শোনালে, দশজনের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেবেন কেমন করে?

এ ভাবনা বোধহয় চেষ্টা করে ছড়াতে হয় না, বিজয়ের সঙ্গে কথা বলবার সমস্ত উৎসাহ ঝেড়ে ফেলে আমি বলেছিলাম, বোধহয় আপনিই ছড়িয়ে যায়।

তাই নাকি? হা-হা করে হেসে উঠেছিল বিজয়, কি সে ভাবনা?

যখন ছড়িয়ে যাবে তখন জানবেন। আগে জানলে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা হঠাৎ পাল্টে যেতে পারে—

হালকা গলার স্বর বিজয়ের, এখন আমার কি ধারণা হয়েছে আপনি জানেন?

ঠিক জানি না।

তাহলে?

অন্তত আমাকে যে পাগল ভাবছেন না, সেটুকু জানি।

ভাবতেও তো পারি।

তাতে কার কি ক্ষতি?

তবে? চতুরের মত আমার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল বিজয়। কথার জালে জড়িয়ে আমাকে হারিয়ে দেয়ার প্রচ্ছন্ন উল্লাসে তার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাহলে কি আপনার ভাবনা, সে-কথা আমি শুনলেও কারুর কোন ক্ষতি নেই।

তার কথা শুনে আমাকেও হাসতে হল। আর আমি তার বুদ্ধির পরিচয় এর মধ্যেই পেয়ে গেলাম বলে সে আবার জোরে হেসে উঠল।

ওদিকে ঘরের বাইরে মা-র পায়ের চাপা শব্দ। বোধহয় ভেতরে আসতে গিয়ে হাসির আওয়াজ শুনে তিনি থেমে গেলেন।

মাকে না দেখতে পেলেও এ ঘরে বসেই আমি বুঝতে পারলাম যে, খুশির আভায় তাঁর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর যে মেয়ে কারুর সঙ্গে বেশি কথা বলতে চায় না—আজ সে আর একজনের মনে আনন্দের বান ডাকিয়েছে। এবং এই আনন্দের সবটুকু কৃতিত্ব যে তাঁরই প্রাপ্য, সে কথা বুঝেই তিনি নিঃসন্দেহে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু আমি তখন বিজয়কে দেখছিলাম। না, চোরা চাউনি নয়, সঙ্কোচের সামান্য স্পর্শ ছিল না আমার দৃষ্টিতে। যথাসময়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে বিজয়। প্রথমদিন মা তাকে নেমন্তন্ন করে এনেছিলেন, সে-কথা ঠিক—কিন্তু আমি জানি না, তারপর কার আমন্ত্রণে সে আসা-যাওয়া শুরু করেছে।

এখন এ বাড়িতে তার আগমন যেন একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আর সে এলেই মা আমার খোঁজ করেন। তার সামনে আমাকে ঠেলে দেন। আমি ঠিক জানি না, হয়তো বিজয় নিজেও মাকে আমার কথা জিজ্ঞেস করে।

প্রথাটা মন্দ নয়। মনের টান থাক বা না থাক, আর একজনকে নিখুঁত কৌশল প্রয়োগ করে আয়ত্তে আনতে হবেই। অর্থের জাল ফেলে অর্থবানকে বন্দী করতে হবে। অর্থ থাকলেই এমনি সব চিন্তা মানুষকে আরও চতুর করে তোলে—মা-বাবার ব্যবহার

দেখেই সে-কথা দিনে দিনে যেন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

তবু আমি বিজয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারি না। একজন যদি আমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে চায়, তার কাছে অকারণে কঠিন হয়ে ওঠা আমার পক্ষে শোভন নয়। তাই আমিও তার সঙ্গে হেসে কথা বলব, আর নিজেও মনে মনে যাচাই করে দেখব, এমন মানুষের সঙ্গে সত্যি আমার কতখানি অমিল।

বিজয় জিজ্ঞেস করে, আপনি বাড়ি থেকে বার হন না?

হই তো!

চলুন, আজ কোথাও ঘুরে আসি।

পাছে আমার মুখ থেকে হাসি বেরিয়ে যায়, তাই আমি বেশ সতর্ক থাকি। এমন নিয়ম যে এদের প্রত্যেকে মেনে চলে, সে কথা আমি জানতাম। আজ বেড়াতে যাওয়া, কাল রেস্তোরাঁ, পরশু সিনেমা আর এরই ফাঁকে-ফাঁকে মন দেয়া-নেয়া।

আমাকে আস্তে আস্তে বিজয় বুঝিয়ে দেবে যে, ও সব দিক থেকে আমাকে গ্রহণ করবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তারপর দুজনে মিলে প্রবেশ করতে হবে কপট প্রেমের একটা বিচিত্র জগতে। সে-জগৎ দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে আসবে। ঘরের দেয়াল ভ্রূকুটি করবে সারাদিন—সারারাত। শুধু নিজেদের ভাবনা ভাবতে হবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে স্বার্থপর হয়ে উঠতে হবে। জীবন সংকীর্ণ—খণ্ডিত। ব্যাপক ভাবনার দিন শেষ। তবু এই কপট প্রেমের জগৎ কী মোহ জাগায় মানুষের মনে!

কোথায় যেতে চান? বিজয়কে আমি জিজ্ঞেস করি।

যেদিকে হয়। আপনি তৈরি হয়ে নিন—বাইরে বেরিয়ে ঠিক করব কোথায় যাব।

আমি তৈরিই আছি।

মাত্র একদিনই আমি বিজয়কেতনের সঙ্গে বেড়াতে গেছি।

আর সেইদিন নিজের ওপর জ্বালাময় বিতৃষ্ণায় আমার শরীর মন হঠাৎ যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। বিজয়ের দিক থেকে কোন ত্রুটি ছিল না। আমার মন জয় করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সে। লৌকিকতার পুরু আবরণটা এক মুহূর্তের জন্যেও সরিয়ে ফেলে নি।

কিন্তু এবার আপনারা আমার সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা ধারণা করে বলতে পারেন, একদিন যদি কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের রস গ্রহণ কর, কিংবা কোন রেস্তোরাঁয় আহার কর, কিংবা অকারণেই কারুর সঙ্গে মাইলের পর মাইল ভ্রমণ কর—তাহলে ক্ষতি কি? আর তোমার মনে আজকের সমাজের অসংখ্য মানুষের ওপর বিতৃষ্ণাই বা জাগে কেন? তাদের থেকে একেবারে আলাদা হয়ে থাকলেই কি তোমার সব বাসনা চরিতার্থ হবে? তারপর হয়তো এক আদর্শবাদী ভেবে আমাকে আপনারা বিদ্রূপ করবেন।

কিন্তু একেবারে আলাদা হয়ে থাকব না বলেই তো আমি বিজয়কেতনের সঙ্গে মিশেছিলাম। আর হঠাৎ একসময় আবিষ্কার করলাম যে, এমন করে নিজেকে আমি প্রবঞ্চনা করতে পারব না। তার চেয়ে বোধহয় আলাদা হয়ে থাকাই আমার পক্ষে অনেক ভাল।

একটা ঝকঝকে ছোট বিলিতি রেস্তোরাঁয় বসে বিজয়কেতন আমাকে দেখছে। সুধা পান করবার কাতর এক দৃষ্টি। বাইরে তার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখছি রেস্তোরাঁর আরও অনেক মানুষকে। চারপাশে ঝলসাচ্ছে দামী দামী শাড়ির রঙ। ফরাসী এসেন্সের উগ্র সুবাস নাকে এসে লাগছে। থেকে থেকে হাসির আওয়াজ যেন জীবনের জমা করা সব মাধুর্য ছড়িয়ে দিচ্ছে এখানে ওখানে।

তখনও বিজয়কেতন কিন্তু আমাকে দেখছে। ও কি পেয়েছে আমার মধ্যে কে জানে। কিন্তু ওর দেখার মধ্যে আমি একটা

ইঙ্গিত পেয়েছি। ও ভেবেছে, আমি ওকে স্বীকার করে নিয়েছি। ওর সঙ্গে আমার টুকরো কথার আলাপ, হাসির বিদ্যুৎছটা আর ভদ্রতার প্রকাশ ওকে যেন আমাকে জয় করে নেবার একটা অধিকার দিয়েছে। তাই বুঝি ও আমাকে নিয়ে আজ বেরিয়ে পড়েছে।

কি খাবেন ?

কিছু না।

বিজয়কেতন হাসে, এটা খাবার জায়গা। এখানে এলে কিছু খেতে হয়। আপনাকে খেতেই হবে।

তাহলে এমন জায়গায় আমাকে নিয়ে এলেন কেন ?

কথায় কথায় অত জেরা করেন কেন ?

বয়কে ডেকে দুজনের জন্য কি খাবার আনতে বলেছিল বিজয়-কেতন, আজ আমার ঠিক মনে পড়ে না। তবে আমি যে কিছুই খেতে পারিনি, সে-কথা মনে আছে।

আমার ভাল লাগছিল না। হালকা হাসির কাটা-কাটা তোড়, নকল সহজ জীবনের বিকট প্রকাশ আমার মনে বার বার শুধু একই প্রশ্ন জাগাচ্ছিল, কেন এখানে এলাম ? বিজয়কেতনের এত কাছা-কাছিই বা এলাম কেন ? হয়তো আমার মুখটা সেদিন একটু বেশি রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। যার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই, তার সঙ্গে এমন করে বেরিয়ে আসা আমাকে নিজের কাছে সুলভ করে তুলেছিল। আমি বাড়ি ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

প্লেটের ওপর চামচ নাড়তে নাড়তে বিজয়কেতন বলেছিল, মনে হচ্ছে আপনার এখানে ভাল লাগছে না—অন্য কোথাও যাবেন ?

আমি বাড়ি যাব।

এত তাড়াতাড়ি ?

হ্যাঁ, আমার অন্য কাজ আছে।

কিন্তু কই, আপনার চিন্তার কথা তো এখনও বললেন না ?

যার সঙ্গে, বেশ আস্তেই আমি বলেছিলাম, মানে, যাদের সঙ্গে আমার কোন মিল নেই, তাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা না করাই ভাল।

খোঁচাটা গায়ে মাখল না বিজয়, মিল আছে কিনা তা এত তাড়াতাড়ি বোঝা যায় না।

খুব বোঝা যায়।

কেমন করে ?

এবার আমি স্পষ্ট বলে ফেলি, এই অল্প ক'দিনে আপনি যদি আমাকে এতটুকু বুঝতে পারতেন, তাহলে ঠিক এমন একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে এসে খাবার জন্য সাধাসাধি করতেন না।

একটু রূঢ় শোনাল যেন বিজয়ের গলার স্বর, আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতাম বলতে পারেন ?

না। একটু থেমে আমি বলেছিলাম, সেটা আমার 'বলবার কথা নয়। বোধহয় আমি নিজেই ঠিক জানি না, যাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারব সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। তবে সেটা নিশ্চয়ই এমন কোন জায়গা যেখানে আমার বাবার বাড়ির আবহাওয়া নেই।

তেমন অনেক জায়গা এই কলকাতা শহরে আছে নিশ্চয়ই, কঠিন হয়ে উঠেছিল বিজয়কেতনের মুখ, তবে আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তেমন জায়গায় আমার যাতায়াত নেই।

সেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার মা বুঝতে পারেননি বলেই তিনি জেনেছিলেন, আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানেই যাব।

আমিই বা আপনাকে আপনার মনের মত জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে জীবনপণ করব, সে-কথা আপনি ভাবলেন কেমন করে ?

আমি হেসে উঠেছিলাম, আপনি বৃথাই রাগ করছেন। এর মধ্যে রাগারাগির কোন প্রশ্ন আসে না। আমার বাড়ির সমস্ত প্রভাব ছাড়িয়ে আমি অন্য এক জায়গায় যেতে চাই—আমাকে যেতে হবেই—

বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বলেছিল, আপনার ব্যক্তিগত কথা আমাকে না হয় নাই শোনালেন।

তবুও সেই মুহূর্তে বিজয়কেতনের ওপর আমি অসন্তুষ্ট হইনি। আমার মনের মধ্যে আরও এক নতুন আবিষ্কারের প্রচ্ছন্ন উল্লাস ঠোঁটের ফাঁকে অল্প-অল্প হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল।

আমি বিজয়কেতনকে আঘাত দিয়েছি কিনা জানি না, কিন্তু তার উৎকট দম্ভ বীভৎস এক স্বার্থপরতার আবরণে আমার চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়েছে। আর তখনই মেকী ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলে প্রকাশিত করে ফেলেছে সে তার আসল রূপ।

স্বল্প পরিচিত একজন মেয়ের কাছে যে কোন কারণেই যদি কেউ এমন অসহিষ্ণু কর্কশ স্বরে কথা বলে, তাহলে তাকে যে মূল্যই আমার মা-বাবা দিন না কেন, আমার কাছে তার দাম কানা-কড়িও নয়।

বিজয়কেতন এখান থেকেই ফিরে যাক। মাকে সে আমার বিরুদ্ধে কি বলবে জানি না, তবে তাকে নিয়ে মা-র সঙ্গে যে আমার অনেক রূঢ় কথার বিনিময় হবে, সে-কথা আমি জানতাম।

বিজয়কেতনকে অনেকদিন আমাদের বাড়িতে আসতে না দেখে বিচলিত হয়ে মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ও আবার কবে আসবে?

কে?

বিজয়কেতন?

আমি কেমন করে জানব?

হঠাৎ জ্বলে উঠলেন আমার মা, তুই জানবি না তো কে জানবে?

তোমরা তাকে নেমন্তন্ন করে এনেছিলে, শুকনো উদাস স্বরে আমি বলি, ওর খবর আমার চেয়ে বেশি তোমারই তো রাখবার কথা।

আমার মা ধৈর্য হারালেন, ন্যাকামি করিস না। তুই ওকে কি বলেছিস শিগগির বল?

কিছু না।

ক্রোধ আর বিষাদ এক হয়ে আমার মা-র সারা মুখ হঠাৎ অদ্ভুত হয়ে উঠল। শরীর কাঁপছিল তাঁর। পরাজয়ের বিকট গ্লানি তাঁকে দিশেহারা করে তুলল। দ্রুতবেগে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। বোধহয় আমাকে প্রহার করবার একটা অদম্য ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসল। আমার হাতদুটো খুব জোরে তিনি ঝাঁকিয়ে দিলেন।

কি ভেবেছিস তুই?

ঠাণ্ডা স্বরে আমি বলি, কি?

বিজয়কেতনের মত ছেলেকে অবহেলা করিস—এত সাহস তোর?

অবহেলা আমি কাউকে করি না।

আমার গলার স্বর শুনে মা যা বোঝবার বুঝে নিলেন। আমি শুধু তাঁর উষ্ণ নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। হঠাৎ কি করবেন, তিনি ঠিক করতে পারলেন না। এমন করে অমন এক পাত্রকে যে ফিরিয়ে দিতে পারে, তাকে কি বলবেন তিনি! তবু মা আমাকে অনেক কথা শোনালেন।

আয়নায় মুখ দেখিস না?

মাঝে মাঝে দেখি।

কে তোকে বিয়ে করবে?

বিয়ে করবার জন্যে আমি খুব বেশি ব্যস্ত নই।

না, দৃঢ়স্বরে মা বললেন, কি মহাকাজে ব্যস্ত তা তুমিই জান।

আমাকে নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হবার কি দরকার মা?

থাম, চীৎকার করে উঠলেন মা, জানি, জীবনের শেষদিন অবধি তুই আমাকে জ্বালাবি। কে আসবে তোকে বিয়ে করতে? পরীক্ষার নম্বর দেখে বিজয়কেতনের মত ভাল ছেলে আসে কখনও? কত কষ্ট করে তাকে আনলাম! আর কয়েকদিন গেলেই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার কথা তাকে বলতে পারতাম। আশ্চর্য জেদী মেয়ে তুই! দিলি সব পণ্ড করে।

পণ্ড করেছি কিনা জানি না, তবে আমাকে নিয়ে তোমরা আর কখনও ব্যস্ত হয়ো না—

না হবে না—কি করবে তুমি শুনি?

যখন সময় আসবে, তখন—

আমাকে বাধা দিয়ে মা বললেন, রাস্তার একটা লোককে বিয়ে করে আমাদের নাম ডোবাবে!

ইচ্ছে করলে মা-র সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ তর্ক করতে পারতাম। আবার নতুন করে অনেক কথা শোনাতে পারতাম তাঁকে। কিন্তু সেদিন আমি থেমে গিয়েছিলাম। আমার গলার স্বর বেদনার ভিজে ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। চোখদুটোও বোধহয় সজল হয়ে উঠেছিল।

কেন এই বেদনা! এর আগে মা-র কোন কথা আমাকে কাঁদায় নি। কিন্তু আজ রূপের খোঁটা আমাকে অদ্ভুত এক যন্ত্রণা দিল। আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, নিজের ঘরে একা একা আমি সকলের অলক্ষে অনেকক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।

আমি যার প্রতীক্ষা করি—যে এসে এই পরিবেশ থেকে আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে—সে কি শুধু আমার রূপ দেখে ফিরে যাবে? আর কিছু দেখবে না? যদি সত্যিই সে দূর থেকে আমাকে দেখে ফিরে যায়, তাহলে আমার মুক্তি আসবে কেমন করে!

এখন দোতলার ঘোরানো বারান্দায় কেউ নেই। মা-বাবা

কোথায় বেরিয়েছেন। চাকর-বাকরদের কোন কাজ নেই। আমি একটু আগে একা-একাই খাওয়া সেরে নিয়েছি।

আমার চোখে আজ ঘুম নেই। বাইরে অমাবস্যার গভীর অন্ধকার। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝলক আসছে। গাছের পাতারা কিছুক্ষণের জন্যে ছন্দের এলোমেলো ঝড় তুলছে। আমি কাছাকাছি সব আলো একে একে নিভিয়ে দিলাম।

শরীরটা হঠাৎ যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। একাকীত্বের পীড়াদায়ক এক যন্ত্রণা। সব চিন্তা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আর কতদিন আমাকে এমন করে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। আমার সমস্ত ভার কবে আর একজনের ওপর তুলে দিতে পারব!

আমার জন্ম-নক্ষত্র অতৃপ্তির কী বিষ মিশিয়ে দিল আমার শিরায়-শিরায়! মানাতে পারি না এদের কারুর সঙ্গে। আমার তৃতীয় নয়ন সারাক্ষণ আমাকে এক নতুন পৃথিবী দেখায়। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে আর একজনেরও যে তা দেখা দরকার!

হাওয়ার প্রবল ঝাপটায় হঠাৎ আমি সচেতন হয়ে উঠি। এ যেন শিশুসুলভ একটা উচ্ছ্বাস। কেন আমি থেকে থেকে আজকাল এমন ভাবপ্রবণ হয়ে উঠি? তবে কি আমার অবচেতনে আশ্চর্য দৌর্বল্য বাসা বেঁধে আছে! আমিও কি এক মধুর স্বার্থপরতার মোহে সব কিছু ভুলে ভোগের অতলে তলিয়ে যাব!

না না। মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে চেনবার চেষ্টা করি।

কত রাত হবে জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই। অন্ধকার আকাশে দু-একটা তারা ছড়িয়ে আছে। আর দূর থেকে হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ ভেসে আসছে একটানা কান্নার মত।

হঠাৎ গাড়ির হর্ন বাজল। নীচে চাকররা ব্যস্ততার সাড়ায় চঞ্চল হয়ে উঠল। মা-বাবা ফিরে আসছেন। এখুনি দারোয়ান

গেট খুলে দেবে। গাড়ি-বারান্দায় আলোটা জ্বলছে। সারারাত জ্বলে। আমি গেটের দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

গাড়ির আলোর বাঁকা উগ্র রেখা ঝলসালো সাদা রঙের একটা দীর্ঘ গাছের গায়ে। তারপর গেট খোলবার শব্দ। মন্থর গতিতে গাড়ি এগিয়ে এল। ডাকতে হল না—বেয়ারা আগে থেকেই গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি অন্ধকার বারান্দায় একা-একা দাঁড়িয়ে প্রায়ই দেখি, যখন কোন পার্টি থেকে রাত করে ওঁরা ফিরে আসেন, তখন আমার মা-র মুখে বিরক্তির কয়েকটা রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি কোনদিকে তাকান না। বাবাকে চাকরের ভরসায় রেখে তুপ তুপ জুতোর শব্দ করে একাই ওপরে উঠে আসেন। শাড়ি বদলাবার আগে বারান্দায় ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়ান।

আর হঠাৎ অত রাতে সেখানে আমাকে আবিষ্কার করে চমকে উঠে মা জিজ্ঞেস করেন, এখনও জেগে আছিস ?

ঘুম আসছে না।

আর একটা ছোট প্রশ্ন, কেউ এসেছিল ?

না।

গাড়ি গ্যারেজে তোলে ড্রাইভার। চাবির রিঙ বাজাতে বাজাতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। খুব আস্তে কথা বললেও দু-একজন চাকরের গলার স্বর বারান্দা থেকে শোনা যায়।

বাবা একটু টলে-টলে ওপরে ওঠেন। তাঁর হাতে পাইপটা কাঁপে। বিলিতি মদের কড়া গন্ধ আমার নাকে এসে লাগে। হাওয়া হঠাৎ কমে গেছে। রাতের চাপে আমার চোখদুটো বুজে আসতে চাইছে। কিন্তু এখান থেকে চলে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

আমার সঙ্গে আর কোন কথা বলেন না মা। আর একটু কাছে সরে এসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা শোবার ঘরের দিকে চলে যান। আমি বারান্দার

অন্য প্রান্তে চলে যাই। আর মোটে কয়েক মিনিট। তারপর আমিও শুতে চলে যাব।

ইচ্ছে করে ওদিকে যাইনি। হঠাৎ কখন গিয়ে পড়েছিলাম মা-বাবার শোবার ঘরের লাগালাগি বারান্দায়। সাধারণত এ সময় ওঁরা কেউই কথা বলেন না। মাঝে মাঝে শুধু মা চিৎকার করে ওঠেন। মুখের সব সংযম হারিয়ে বাবাকে গালাগাল করেন।

সেই এক কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি বলে যান, তাঁর নাম আজ লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ত, কিন্তু বাবা তাঁকে সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। এক কৃত্রিম পরিবেশে রেখে দিনের পর দিন তাঁকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়েছেন। তাঁর মত মহিলার এমন করে বেঁচে থাকবার কি অর্থ হয়! গভীর রাত্রে মূল্যবান শয্যায় ছটফট করতে করতে তীক্ষ্নস্বরে মা বাবাকে অভিশাপ দিয়ে চলেন।

কিন্তু নিঃঝুম অন্ধকারে কেন মা-র এই প্রবল আর্তনাদ! হ্যাঁ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানে আর্তনাদের মতই শোনাত। হাসি খেলত না তখন আমার ঠোঁটে।

মা-র জন্যে হঠাৎ আমি বেদনা অনুভব করতাম। সাড়ম্বর জীবনের সব দাম চুকিয়ে হয়তো ঘুমের ঠিক আগে আগে তিনি প্রবল যন্ত্রণায় নিজের মধ্যে অন্য আর একজনকে আবিষ্কার করেন। নতুন করে বাঁচতে চান। সুপ্ত শিল্পীসত্তা কে জানে তাঁর ক্লান্ত মনে অন্য আর এক জগতের ঠিকানা আনে কি-না।

আজ কিন্তু আমি মা-র প্রশ্নের উত্তরে বাবার গলার ভারী স্বর শুনতে পাই।

কেমন কৌতূহল জাগে আমার। হয়তো সরে যাওয়া উচিত ছিল। এসব শুনে আমার কি লাভ! আমি তো জানি এই জীবনযাত্রার মধ্যে দম্ভ ছাড়া আর কিছু নেই। ওঁরা হয়তো এখুনি কলহের সপ্তম স্বরে এই থমথমে রাতকে চমকে দেবেন।

এমন প্রায়ই হয়। আমি ছাড়া সে-খবর আর কেউই রাখে না। কিন্তু তবু আমার বাবা ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক।

কাঁপা-কাঁপা জড়ানো স্বরে তিনি মাকে জিজ্ঞেস করেন, কি চাও বল—কি চাও?

জান না? জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে না?

আই অ্যাম সরি, যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বাবার, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

তা পারবে কেন? কোনদিন তুমি আমার কথা ভেবেছ? কি করেছ তুমি আমার জন্য?

ওয়েল, তুমি কি চাও বল?

আমি যা চাই তা দেবার ক্ষমতা তোমার নেই, হঠাৎ আমার মা-র তাঁর মৃত বাবার কথা মনে পড়ে যায়, প্রফেসারের মেয়ে ছিলাম বলেই লেখার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল, হতাশ স্বরে তিনি বলে ওঠেন, কিন্তু আজ!

বাঃ, বাবার গলার স্বর যেন আরও বেশি জড়িয়ে যায়, তুমি তো লেখ—আর সারাদিন কেউ তোমাকে কোনরকম বিরক্ত করে বলেও তো মনে হয় না—

তুমি কিছু বোঝবার চেষ্টা করো না, প্লীজ, মা ফোঁপাতে থাকেন, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না—পারব না—

বাঃ! দূর থেকে বাবার গলার স্বর অদ্ভুত করুণ শোনায়, কিন্তু তুমি কাঁদবে কেন?

হয়তো এখন বাড়ির আর একটি লোকও জেগে নেই মনে করে মা আরও চীৎকার করে বলেন, কি করেছ তুমি আমার জন্যে—কী করেছ?

কিন্তু কি করতে বল তুমি আমাকে সরমা?

বাবার কথা যেন মা শুনতে পাননি এমনভাবে বলেন, একটা বড় বাড়িতে বসে কয়েক ঘণ্টা লিখতে পারলেই কি সব কাজ হয়ে

যায় ? কে শুনবে সে-লেখা ? কে সমালোচনা করবে ? কারা প্রকাশ করবে ?

থেমে থেমে কথা বলেন বাবা, তা—মানে, একটা ব্যবস্থা করলেই তো হয়—

এখানে থেকে কোন ব্যবস্থা করা যায় না। খালি পার্টি আর পার্টি। নিয়ম আর শৃঙ্খলা। তোমার অফিস আর অফিসের লোক ছাড়া যেন আর কিছু নেই—আর কোন লোক নেই—

না না, তা থাকবে না কেন ?

বাট হোয়ার আর দে ? তারা কি এখানে এসে আমার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা করবার সুযোগ পায় ?

বেশ তো, যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন আমার বাবা, তুমি ডাক না যাকে-যাকে ডাকতে চাও—একদিন একটা স্পেশাল পার্টি দিলেই তো হয়—

বাবাকে বাধা দিয়ে ক্ষিপ্ত স্বরে মা বলেন, কাউকে চিনি আমি ? কাউকে জানি ? লেখক-সম্পাদকরা আমার ডাকে আসবে বা কেন ?

বেশ তো, এই গম্ভীর সমস্যার কোন সমাধান করতে না পেরে বাবা বলেন, আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে—

অনেক করেছ, বিদ্রূপের শ্লেষ কাঁপে মা-র কথায়, আর কেন ? তার চেয়ে সব যেমন চলছে তেমন চলুক।

না না, আমি কালই সনৎকে আসতে বলব—

কে সনৎ ?

ক্লান্ত স্বরে বাবা বলেন, ভেরি ব্রাইট বয়। একটু-আধটু লিখতেও পারে বোধহয়—

কিন্তু সে এখানে এসে কি করবে ?

তোমার সঙ্গে কথা বলে লেখার ব্যাপারে সাহায্য করবে। ব্যস তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা একটু ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু তুমি ওকে চিনলে কেমন করে ?

প্রায়ই আসে আমার অফিসে, ফস করে দেশলাই জ্বালাবার শব্দ শুনতে পাই আমি, একজনের চিঠি নিয়ে প্রথম দিন এসেছিল —একটা চাকরি চায়—

বাবার কথা শুনে মা আশ্বস্ত হন কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি ওঁদের কারুর গলার স্বর শুনতে পাই না।

হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ আছে এখন। অর্কিডগুলো আস্তে আস্তে দুলছে। হয়তো আমাদের বাড়ির কোন গাছ থেকে একটা রাত-জাগা পাখি কর্কশ স্বরে চিৎকার করে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আর অনেক দূরে কোন ক্লান্ত শ্রমিক গলা ছেড়ে গান গাইছে।

এখন আমার চোখে ঘুম নেই। নিঝুম অন্ধকারে বুদ্ধ-মন্দিরের ঘণ্টা শোনবার জন্যে কান পেতে থাকি। মা-র আর্তনাদ আমার ভাল লাগে নি। এখন তাঁকে আমার হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু অন্ধকার চিরে-চিরে কে একজন এদিকে এগিয়ে আসছে। পায়ের শব্দ নেই তার। চলার গতিও শ্লথ। তবু সে আসছে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু মনে মনে তার গতির গুঞ্জন অনুভব করতে পারছি। বিপুল আনন্দের সূক্ষ্মতম অনুভূতি।

আজ পূর্ণিমা নয় কেন! কেন আমাকে ঘিরে রয়েছে গভীর থমথমে অন্ধকার। আমার জন্ম-প্রহর আমি আবার নতুন করে শিরায়-শিরায় অনুভব করি। এখান থেকে আমাকে যেতে হবেই।

হাজার হাজার বছর আগে এমনি আর একটা রাত এসেছিল। প্রজ্ঞাময়ী অবিস্মরণীয় একটি রাত!

গৌতম বুদ্ধের শোনিত-তরঙ্গে সেদিন হয়তো এমনি আনন্দের বান ডেকেছিল। তন্দ্রার ক্লান্তি ছিল না তাঁর নয়নে। মনের নিভৃত লোক থেকে চিরন্তন সঙ্গীত-ঝঙ্কার ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠেছিল।

সে-সুরে জ্বালা ছিল না। আক্রোশ ছিল না। মায়া থেকে, লোভ থেকে, পাপ থেকে, ক্রন্দন থেকে, আর পৃথিবীর সব বন্ধন থেকে মুক্ত করে নেয়ার দুর্বার ইঙ্গিত জ্বলে উঠেছিল।

তখন সমস্ত সংসার ঘুমিয়ে আছে। জেগে আছেন শুধু প্রজ্ঞার মূর্তিমান প্রতীক। গোপার অপরূপ লাবণ্যরাশি তাঁকে বাঁধতে পারল না। পুত্রের ঘুমন্ত মুখ বেদনার কোন অনুরণন জাগাল না তাঁর মনে। রাজপ্রাসাদের সব আড়ম্বর তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হল। তিনি অগ্রসর হলেন বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলের জন্যে।

কিন্তু কোন্ শক্তি তাঁকে টেনে নিয়ে গেল সংসার আর রাজ-প্রাসাদের সব আকর্ষণ গুঁড়ো-গুঁড়ো করে! কোন্ আনন্দের বিপুল জোয়ার তাঁকে নিয়ে এল নির্জন সাধনার ক্ষেত্রে! কে তাঁকে দিয়েছিল সঠিক পথের সন্ধান!

নির্জন আকাশে একটা তারা ঝিমঝিম করছে। তন্দ্রা-জড়িমা ছড়িয়ে পড়েছে গাছের পাতায়। কিন্তু আমি যেন চলবার সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। এ বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথায় চলে যাবার ইচ্ছেও ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

বুদ্ধির প্রতিভায় উজ্জ্বল রাজপুত্রের নামের সঙ্গে আমার জন্ম-সূত্র কোন রহস্যের ইঙ্গিতে বাঁধা থাকলেও অমিলের একটা রেখা আজ আমি আবিষ্কার করি। ভাবপ্রবণতার ঘোরে নয়, বুদ্ধি দিয়েই এক অলৌকিক আলোয় আমি যেন নতুন করে নিজেকে চিনে নি।

সাধনার নির্জন কোন ক্ষেত্রে আমি গোপনে রাতের অন্ধকারে সরে যাব না। আমি সকলের মাঝে থেকেই অপার আনন্দের স্বাদ পাবার চেষ্টা করব। লোভ আর পাপ সম্বল করে চারদিকে যে বিপুল অর্থের স্তূপ জমা হচ্ছে—তার কোন ভাগ আমি নেব না। আর আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে নির্লজ্জ এই শোষণের সিংহদ্বার রুদ্ধ করে দেব।

শুধু নির্জন সাধনায় বঞ্চিতের মুক্তি আসবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু সংগ্রামে যে আসবেই সে-কথা মেনে নিতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়িটাকেই আমি ভাল করে আর একবার দেখি। একটি-একটি করে ইঁট খসে পড়বে। মূল্যবান শয্যা ঢাকা পড়ে যাবে আবর্জনার স্তূপে। এমনি অন্ধকার নামবে চারপাশে। শূন্যতার দম্ভ নিয়ে কারুর বাস করবার জায়গা থাকবে না কোথাও।

তখন কোলাহল জাগবে বাইরে। বাঁচবার আনন্দে অধীর হয়ে উঠবে একদল লোক। তারা বাঁচবে। চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখবে তাদের বাঁচার অধিকার।

আর আমি শুধু প্রতীক্ষা করব। আমিও বেঁচে থাকব ওদের সঙ্গে তৃপ্তির পূর্ণ আনন্দ নিয়ে। আজকের মত এই তীব্র দাহ আমাকে এত রাত অবধি যন্ত্রণা-জর্জর মূক বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখবে না। নিশ্চিন্ত তন্দ্রা আস্তে আস্তে আমাকে বিশ্রামের অবসর দেবে।

কিন্তু সে কবে!

চার

এক সকালবেলা ছুটির দিনে সনৎ প্রথম এল আমাদের বাড়িতে।

মা বাবাকে বলে দিয়েছিলেন এ সময় ওকে আসবার কথা বলতে। কারণ বিকেলে নানা লোকের ভিড়ে মা-র লেখার মেজাজ থাকে না। তখন সনৎ এলে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার মূল্য দিতে ইতস্তত করবে, সে-কথা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন বলে সকালের দিকে সনৎকে আসতে বলেছিলেন।

মা-র লেখবার সময় দোতলার ঘোরানো বারান্দায় আজ বোধহয় বাবা প্রথম এলেন। মা নির্দেশ দিয়েছিলেন বাবাকে যেন সনৎ তাঁকে এমন সময় প্রথম দেখতে পায়।

তিনি যখন মাথা নিচু করে একমনে লিখে যাবেন—অলৌকিক ঘোরের রেশ থাকবে তাঁর চোখে—ইতস্তত ছড়ানো থাকবে বড় বড় সাদা কাগজ, তখন যেন বাবা সনৎকে নিয়ে সোজা ওপরে উঠে এসে মা-র সে-মূর্তি তাকে দেখান। আগে থেকে তাকে খবর দেবার কোন দরকার নেই।

কিন্তু সনৎকে সবচেয়ে আগে আমিই দেখলাম।

বাবা তখন ড্রইংরুমে বসে পাইপ টানতে টানতে একটা খবরের কাগজ নাড়া-চাড়া করছিলেন। আর আমি অল্প-অল্প রোদে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ঠিক তখন একটি ছেলে গেট খুলে সোজা এগিয়ে এল।

দারোয়ানকে বাবা বোধহয় সনতের আসবার কথা আগে থেকে বলে রেখেছিলেন। তা না হলে সে তাকে সোজা ভেতরে ঢুকতে দিত না। কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে জানতে চাইত সে কোথা থেকে আসছে আর কার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমাদের বাড়িতে যারা হেঁটে আসে, তাদের সম্পর্কে মা-বাবার

মত দারোয়ান-বেয়ারাও কোন কৌতূহল দেখায় না। আর অনেককে বাইরে থেকেই বিদায় করে দেওয়া হয়।

কারণ, এই পায়ে চলা আগন্তুকদের মধ্যে কেউ কেউ বাবার কাছে আসে চাকরি চাইতে—কেউ কেউ নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা চায়, কিংবা অন্য কোন রকম সাহায্য চেয়ে মা-বাবাকে বিরক্ত করে।

দারোয়ান সনৎকে নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকতেই বাবা উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, এস—এস!

গুড মর্নিং, সনৎ ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমিও ভাল করে তাকে দেখে নিলাম। চেনা-চেনা চেহারা। এদিক-ওদিক—কলেজ যাবাব কিংবা আসবার সময় কোথাও না কোথাও তাকে আমি দেখেছি। গায়ের রঙ কালো। চোখ দুটো উজ্জ্বল। চলায়-বলায় কোনরকম জড়তা নেই। সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছে। বুক-পকেটে একটা কলম গোঁজা। কেউ না ডাকতেই আমি আস্তে আস্তে ড্রইংরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

নিভে-যাওয়া পাইপ জ্বালাতে জ্বালাতে দাঁতে দাঁত চেপে বাবা বললেন, আমার মেয়ে।

সনৎ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, আপনিও লেখেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। আমার মা লেখেন।

চল সনৎ, বাবা দরজার পর্দা তুলে বললেন, তোমাকে ওপরে নিয়ে যাই।

আমাকে দেখল সনৎ, চলুন।

কেন যে সে-সময় আমিও ওপরে গেলাম আর ওদের সঙ্গে বসে রইলাম অনেকক্ষণ, সে-কথা আজ আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। প্রকাশ না করলেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মা আমাকে

দেখে সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, তিনি অনেক বলেও আমাকে ঘরের বার করতে পারেন নি—অনেক ডেকেও বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি—আজ সেই আমি নিজের থেকে এসে এখানে বসে সনতের সঙ্গে মা-র সাহিত্য-আলোচনা শুনছি।

বাবাকে কিছু বলতে হয় নি। পায়ের শব্দ শুনেই মা সনতের দিকে তাকিয়েছিলেন। রঙ কালো, রোগা একটা ছেলে। ঘন চুল। চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। চলা-ফেরায় কোন সঙ্কোচ কিংবা জড়তা নেই।

তুমিই সনৎ? কলম নামিয়ে রেখে মা মৃদু হাসলেন।

হ্যাঁ। সনৎ সিংহ।

কবে থেকে মিস্টার মুখার্জীকে বলছি তোমাকে এখানে নিয়ে আসবার কথা—

সনতের চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। বোধহয় সে হঠাৎ বুঝতে পারল না মিস্টার মুখার্জী বলতে মা কাকে বুঝাচ্ছেন। বাবা সনৎকে এখানে পৌঁছে দিয়ে নেমে গেছেন। তা না হলে হয়তো কথা বলবার সময় মা তার দিকে একবার তাকাতেন, আর তখনই সনৎ বুঝতে পারত মা বাবাকে লক্ষ্য করে কথা বলছেন।

প্রথম থেকেই সাহিত্যের কথা শুরু করলেন মা, তোমার কোন বই বেরিয়েছে নাকি সনৎ?

না, একটু থেমে সনৎ বলল, এখনও সময় হয়নি।

পত্রিকায় লেখ তো, না?

হ্যাঁ।

কোথায়?

একটা পত্রিকার নাম করে সনৎ বলল, এই কাগজেই মাঝে মাঝে লিখি, কারণ—

কি একটা বলতে যাচ্ছিল সনৎ, কিন্তু মা বাধা দিয়ে বললেন, আচ্ছা, ওদের ব্যাপারটা কি বল তো ?

কি ?

মানে, ও কাগজের সম্পাদক কি লেখা-টেখা পড়ে দেখে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ—

তাহলে লোকটা বোকা। মাসের পর মাস দেখি যত আজে-বাজে লেখা বার হয়, অথচ আমার বেলায়--

হালকা হেসে সনৎ বলল, ওদের বিচার একটু কঠিন। আর সেই কারণেই বোধহয় কাগজটার মান সবচেয়ে উঁচু—

ছাই, মা বিদ্বেষ প্রকাশ করে বললেন, কি যে ব্যাপার বুঝি না। জান, কত পড়াশুনো করে লিখি আমি ? তোমাকে নীচে আমার লাইব্রেরিতে নিয়ে যাব একটু পরে। গত মাসেই তুশো টাকার দর্শনেব বই কিনেছি।

সনৎ হেসে বলল, ও।

আজকালকার সম্পাদকগুলোও হয়েছে যেমন। কি যে ওরা চায়, বুঝি না। আর এখন যা হচ্ছে, তাকে কি তুমি সাহিত্য বল ?

অল্প হেসে বারান্দার রেলিংয়ের দিকে তাকিয়ে সনৎ বলল, এখনও বিচারের সময় হয়তো আসেনি।

আর কোনদিনও আসবে না। আমাকেও দেখছি এবার থেকে ওইসব আজে-বাজে লেখাই লিখতে হবে।

কেন ?

তা না হলে ছাপবে কে বল ?

আপনি নিজেই।

কেমন করে ?

এদিক-ওদিক তাকাল সনৎ। একবার কাছের পর্দার দিকে, আর একবার দূরের গাছের দিকে। একবার মা-র মুখের দিকে,

তারপর আমার দিকে। হাসছে আমাকে দেখতে দেখতে। তেমন করে হাসতে আমি আর কখনও কোন ছেলেকে দেখিনি।

মাকে বলল ও, আপনি নিজেই একটা পত্রিকা প্রকাশ করুন।

দূর, তা কি হয়!

হবে না কেন? হয়। আর তাহলে আপনি অনেক নতুন লেখকও তৈরি করবেন, আমার দিকে ফিরে সনৎ বলল, আপনিও লিখবেন এই পত্রিকায়। কি বলেন? লিখবেন তো?

আমি লিখতে পারি না।

যাঁরা সত্যি ভাল লেখেন, তাঁরা সকলেই আপনার মত এমন কথা বলেন—

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্যে মা তাড়াতাড়ি বললেন, একটা পত্রিকা বের করতে কত টাকা লাগে সনৎ?

কত আর? হাজার দু-চার প্রথমে। আর আপনাদের তো অনেকের সঙ্গেই আলাপ। বিজ্ঞাপন পেতেও কোন অসুবিধা হবে না।

তুমি সম্পাদক হবে সনৎ?

আপনি থাকতে আমি হব কেন? বিনয় প্রকাশ করে সনৎ বলল, আপনি আমার চেয়ে কত বেশি বোঝেন!

সনতের কথা শুনে খুশিতে ভেঙে পড়লেন আমার মা, কি নাম দেবে পত্রিকার?

সে একটা নাম ঠিক করা যাবে এখন, আমার দিকে ফিরে স্পষ্ট সহজ প্রশ্ন করল সনৎ, আপনার নাম কি?

আমারও দ্বিধা হল না উত্তর দিতে, শ্রীমতী।

তারপর?

আর কিছু নেই, অকারণেই গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে আমি বললাম, আমার পদবী বোধহয় আপনি জানেন।

সুন্দর নাম, নিজের পকেট থেকে কলমটা বের করে মুখের

কাছে নিয়ে এল সনৎ, পত্রিকার জীবন্ত নাম তো কাছেই রয়েছে।

সনৎ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু আমি দেখেছিলাম আমার মা-র মুখের আশে-পাশে কালো একটা ছায়ার আবির্ভাব। অপ্রসন্ন চোখের দৃষ্টি। তাঁকে ছাড়িয়ে কারুর কাছেই কোনদিক থেকে আমি প্রধান হয়ে উঠতে পারি না। টেবিলের ওপর চেপে-চেপে একটা হাত ছড়ালেন তিনি। বেয়ারাকে ডেকে কফির পট ভরে দিতে বললেন। নতুন একটা কাপ ঠেলে দিলেন সনতের দিকে।

আর কিছু খাবে ?

না থাক। শুধু এক কাপ কফি।

কয়েক মিনিট চুপচাপ। সনৎ মাঝে মাঝে আমাকে দেখছে। ওর এখন কি মনে হচ্ছে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মা-র মনের কথা কিন্তু ধরতে পেরেছি। আমি এখন এখান থেকে চলে গেলেই তিনি খুশি হন।

কিন্তু আজ আমার কি যে হয়েছে, আমি জানি না। এই পুরনো বারান্দা আজ অদ্ভুত ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে চুম্বকের মত টেনে রেখেছে আমাকে। আমি চলে যেতে চাই, কিন্তু যাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। একজন অতি সাধারণ ছেলে—আমার মা-বাবার চোখে যে একেবারেই নিষ্প্রভ – হঠাৎ আমার চরিত্রে যেন একটা সাংঘাতিক পরিবর্তন এনেছে। এমন অলৌকিক রূপান্তরের কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

আশ্চর্য ! একে তো আমি চিনি না। জানি না ! কটা কথাই বা আমি বলেছি তার সঙ্গে।

কিন্তু আমার ভাল লাগছে। সব কিছু ভেঙে হুড়মুড় করে এমন একজন মানুষ এসে পড়ছে, যে এখানে একেবারেই বেমানান। ওর মত মানুষের এ-বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। তবু সে আসতে পেরেছে। তবু সে সম্মান পেয়েছে। ওকে নিয়েই নিয়ম ভেঙে সকালবেলা বাবা

মা-র টেবিলের কাছে আসতে পেরেছেন। ওকে দেখেই লেখা থামিয়ে মা কথা বলতে শুরু করেছেন !

এ বাড়ির সব নিয়ম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ও পালটে দিয়েছে। আরও দেবে। সাজ-সরঞ্জাম না থাকলেও যেন বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, সে-কথা আজ এ-বাড়ির অন্য কেউ হয়তো বুঝতে পারেনি—কিন্তু আমি পেরেছি। নিজেই জানি না কেমন করে !

দুঃসহ চমকের মত মা-র কণ্ঠস্বর বাজল, পত্রিকার একটা নাম ভেবে একসময় ঠিক করা যাবে সনৎ, মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি—

দেখুন। তবে কাগজ বেরুলে আমার মনে হয় শ্রীমতী নামটাই—

আমাকে দেখতে দেখতে সনৎ কফির কাপ ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল।

একটু শব্দ করেই নিজের কাপটা মা টেবিলের ওপর রাখলেন, বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে জন্মেছিল বলে ওই নাম। আমাদের কাগজ কবে বেরুবে তার তো কিছু ঠিক নেই—

এবার ঈষৎ বিরক্তির ভান করে আমি সনৎকে বললাম, নাম নিয়ে—কিছু আরম্ভ হবার আগেই—আপনি বড় বেশি ব্যস্ত হচ্ছেন—

কিন্তু নাম ঠিক না হলে এক পা-ও যে এগুনো যায় না।

আর কাগজের মান যদি তৃতীয় শ্রেণীর হয় ? শুধু শুধু আমার নাম ডুবিয়ে আপনি ছেলেমানুষের মত খেলা করতে চান কেন ?

আমার উষ্মা কৃত্রিম না অকৃত্রিম, সনৎ বোধহয় বুঝতে পারল না। তবু হাসল। উঠে দাঁড়াল। মা-র দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর ঝাঁজ। আজ আমি বিচলিত হলাম ! সনৎ এখুনি চলে যাবে নাকি ? কী বোকা ও ! মিছে অভিমান ! চেয়ার টেনে আবার বসে পড়ল সে।

কাগজ খারাপ হবে কেন ? কঠিন গম্ভীর প্রশ্ন।

ভালই বা হবে কেমন করে ?

আমরা চেষ্টা করব—

আপনার কথায় আমিই বা আস্থা রাখব কেন ?

আমি প্রাণপণ পরিশ্রম করব।

তার চেয়েও বড় কথা হল ক্ষমতা—আপনার ক্ষমতা কতটুকু ?

একা কেউ একটা কাগজ চালায় না মিস মুখার্জি—

আমাকে শ্রীমতী বলে ডাকবেন।

কথার তোড় হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সনতের। ও দিশা হারাল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। মাকে দেখল। বিষণ্ণ। গম্ভীর। বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি। কি করবে হঠাৎ ভেবে ঠিক করতে না পেরে নিজের মাথায় আঙুল চালায় কয়েকবার। আভা-বিচ্ছুরিত মুখ। হঠাৎ আসা খুশির ঝলকে ও বোধহয় উদভ্রান্ত। মূক।

ওর গলার স্বর স্তিমিত হয়ে এসেছে, নাম নিয়ে খেলা। বেশ বলেছেন। তবু তো নামটা কোন না কোন কাজে লাগবে। আর কাগজের মান খারাপ হলেও নামে কোন কালি লাগবে না---পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে নামটা হয়তো চিরকালই বেঁচে থাকবে।

জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে মা বললেন, শুরু না হতেই সারা হয়ে যাবার কথা বল কেন সনৎ ?

আপনার মেয়েই তো সে-কথা আমাকে দিয়ে জোর করে বলাচ্ছেন। আপনি ওঁকে থামতে বলুন।

তুমি কোথায় থাক সনৎ ?

এখান থেকে অনেক দূরের একটা মেসে।

মেসে ?

হ্যাঁ। তা ছাড়া থাকবার আর কোন জায়গা নেই।

তোমার মা-বাবা ?

কেউ বেঁচে নেই। ট্যুশনি করে কোনরকমে লেখাপড়া শিখেছি—এখন একটা চাকরির চেষ্টা করছি।

বেশ তো আছ সনৎ, মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, শুধু শুধু কেন চাকরি করতে চাও?

একটা চাকরির খুব দরকার।

কেন? শুধু লিখে বেঁচে থাকতে পার না?

কিন্তু এখনও তো কিছুই লিখতে পারি নি। সবে আরম্ভ করেছি। শুধু লিখে কেমন করে বেঁচে থাকব?

না খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না?

আমার মা-র-মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সনৎ উত্তর দিল, না।

তুমি জান না সনৎ, বেঁচে থাকা যায়। আমি পারি। তুমি সব কিছু কেড়ে নাও আমার কাছ থেকে। শুধু দিয়ে যাও একটা কলম আর একরাশ সাদা কাগজ—খাবার কথা আমার মনেও থাকবে না।

কতদিন?

চিরকাল।

ম্লান হাসির ছটা সনতের ঠোঁটে, কিন্তু বিবর্ণ মুখ, আপনি কি কখনও না খেয়ে থেকেছেন?

না। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি না খেয়ে থাকতে পারি।

ইচ্ছে করলে? আর আমি কোন একসময় দিনের পর দিন প্রায় না খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি। সেই অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েছি—পাসও করেছি।

তবে?

কিন্তু একটা আক্রোশ—ভয়ঙ্কর এক যন্ত্রণা—আমার শুভবুদ্ধি, আমার চৈতন্য ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। পীড়নের সে-যন্ত্রণায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়।

কিন্তু নিজে আগুনের ঝাঁজের মধ্যে দিয়ে না এলে জেগে উঠবে কেমন করে?

মা-র দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সনৎ। হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে থেমে-থেমে বেশ সুন্দর কথা বলতে পারেন আমার মা। আমি পারি না।

সনৎ আমাকে আর দেখছে না এখন। মাকেই দেখছে। দেখুক।

আমার সকালবেলার মা-র কথা শুনে তন্ময় হয়ে গেছে সনৎ। কিন্তু যদি কখনও এমন হয় মানে যদি আজ এ-বাড়িতে তার প্রথম ও শেষ আসা না হয়, তাহলে ও একদিন হয়তো হঠাৎ কোন সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে এসে পড়বে। মা-র চেহারাটাই বদলে গেছে তখন। পার্টির কলরবে ফুটে উঠেছে অন্য আর এক লাস্যময়ী রূপ।

তখনও একবার আমার এই মাকেই দেখুক সনৎ। আমি থাকব কাছাকাছি এদিকে-ওদিকে কোথাও। লক্ষ্য করব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। •দেখব ও কি করে। আঘাত পায় কি না, আর ওর নিজের চেহারাটাই বা কেমন দেখায়।

কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি। হয়তো সত্যি এতদিন বিরুদ্ধ পরিবেশের উগ্র তাপে আমি আমার মাকে ভাল করে চিনতে পারিনি। যদি সনৎ আসে নিয়মিত এ বাড়িতে, যদি সত্যি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আর পাঁচজনের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে মা-র নাম—তাহলে, কে জানে, মনের সূক্ষ্ম অব্যক্ত আনন্দের অনুপ্রেরণায় তিনি নতুন আর এক মানুষ হয়ে উঠবেন কিনা। আর তখন চারপাশের বৈভবের কোন মূল্য তার কাছে থাকবে না।

আজ কোন্ তিথি আমার জানা নেই। কিন্তু সতেজ একটা দিন হঠাৎ আমাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। মধুর একটা দম্ভ—যার স্বাদ আমি আগে কোনদিনও পাই নি—আজ মনের নিভৃত সুপ্ত কোণ থেকে আমার নতুন মূল্যায়নের সুর গাইছে। তাই আমার মাকেও আমি অন্য চোখে দেখতে পারছি।

এবার মাকে বলল সনৎ, আপনার কোন লেখা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আপনি খুব ভাল লেখা লিখবেন।

মধুর হেসে মা বললেন, লিখতে পারি সনৎ, যদি তুমি আমাকে এখান থেকে তোমার মেসে নিয়ে গিয়ে রাখতে পার।

কী যে বলেন, মুখ নামিয়ে দীপ্তিহীন হালকা হাসি হাসল সনৎ, কোন্ দুঃখে আপনি যাবেন সেখানে ?

কারণ এই পরিবেশে থেকে বড় কিছু সৃষ্টি করা যায় না।

কিন্তু, স্বরে বেশ জোর দিয়ে সনৎ বলল, আমি এখন যে জীবন কাটাই, তার ওপর আমার এক তিলও শ্রদ্ধা নেই—

মা যেন ধিক্কার দিয়ে উঠলেন সনৎকে, ছি ছি, তুমি দারিদ্র্যকে ভয় কর ? আর এই মন নিয়ে তুমি লেখক বলে নাম করতে চাও ?

চমকে ওঠার ভঙ্গিতে সনৎ উত্তর দিল, না, ভয় করি না। কোন এক মহত্তর সত্যকে বরণ করে নেয়ার জন্যে দারিদ্র্যের সব পীড়ন সহ্য করতে রাজি। কিন্তু এ জীবন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে এটা মানুষেরই কারসাজি বলে।

তবু এ উপলব্ধি তোমার তো দারিদ্র্যের মধ্যেই হল ?

হ্যাঁ। তাই এ জীবন থেকে আমি মুক্তি চাই।

কিন্তু কি তোমার অস্ত্র ?

আমার মত অসংখ্য মানুষ।

আর তোমার সাহিত্য ?

অস্ত্র নয় নিশ্চয়ই—

তাহলে ?

আমার উপলব্ধির মুকুর।

ঠিক বলেছ, মা প্রশংসার দৃষ্টি দিলেন তার দিকে, তুমি সত্যিই ভাল লিখতে পারবে।

আপনিও পারবেন।

আমার দু-একটা বই খুঁজে রাখব তোমাকে দেবার জন্যে। তুমি আবার কবে আসবে বল তো ?

বলুন ? আমি তো বেকার। যখনই আসতে বলবেন তখনই আসব, আমার দিকে তাকিয়ে সে হেসে জিজ্ঞেস করল, কই, আপনি যে অনেকক্ষণ কথা বলছেন না ?

শুনছি। কথা বলার চেয়ে শুনতে আমার আরও অনেক বেশি ভাল লাগে, একটু থেমে বললাম, তাছাড়া আপনাদের মতো সুন্দর করে কথা বলতে আমি জানি না।

আমরাই কি জানি ? আপনি লেখিকার মেয়ে—এমন পরিবেশে আছেন ! আপনার চারপাশের সবই সুন্দর। আপনার তো সবচেয়ে আগে সুন্দর করে কথা বলতে শেখা উচিত—

হালকা হেসে আমি বললাম, কিন্তু আমি যে লেখিকা নই।

দুষ্টু একটা ছেলের মতো মনে হল সনৎকে। 'সুন্দর' কথাটার ওপর একটু বেশি জোর দিয়ে সে বলল, তবে বুঝি অন্য কোন সুন্দর কাজ নিয়ে মেতে আছেন ? কি সে সুন্দর কাজ ?

কোন কাজ নেই।

লেখাপড়া ?

শেষ হয়ে গেছে।

খুব ভাল কথা—তাহলে পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে এঁকে সাহায্য করবার কাজ হল আপনার।

তার জন্যে তো আপনিই রয়েছেন।

গম্ভীর স্বরে থেমে থেমে মা শুধু বললেন, আগে কাগজ বার হক—এরপর যেদিন আসবে সনৎ সেদিন তোমার কয়েকটা লেখা নিয়ে এস—

আনব। আজ আপনি কিছু পড়ে শোনাবেন ? না না, ব্যস্ত হয়ে ও আবার উঠে দাঁড়াল, এবার আমি যাই। আপনাদের

হয়তো অন্য অনেক কাজ আছে—আমি শুধু শুধু এতক্ষণ সময় নষ্ট করলাম।

গলার স্বরে স্নেহের মিষ্টি রস ঝরিয়ে মা হাসিমুখে বললেন, দূর পাগল! সারা সকাল শুধু লেখা ছাড়া আর কোন কাজ আমি করি না করতে পারি না, টেবিল থেকে কতকগুলো কাগজ হাতে তুলে নিয়ে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, আর আজ সত্যি সত্যি যেন একজন মনের মত মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারলাম!

আমাকে লজ্জা দেবেন না—

না না সনৎ, বিশ্বাস কর, আমি ঠিক কথাই বলছি।

এবার কিছু পড়ে শোনান।

মা-র চেহারা দেখে তখন আমার মনে হঠাৎ কোথা থেকে কালো-কালো ভারী মেঘ জমে উঠেছিল। গল্প শোনাবার জন্যে তাঁকে কেউ এমন করে অনুরোধ করে নি। তিনি জোর করে শোনালে আমি উৎসাহ প্রকাশ করিনি আর আমার •বাবা একেবারেই অন্য ধরনের মানুষ। তিনি আগ্রহ দেখালেও মা তেমন শ্রোতা পেয়ে সুখী হতে পারেন না। তাই বুঝি আজ তাঁর জন্যে অনেকদিনের মরচে পড়া বন্ধ একটা অর্গল হঠাৎ ঝন্ করে খুলে পড়েছে।

আমার উপস্থিতি তাঁকে নিশ্চয়ই অস্বস্তির খোঁচা দিচ্ছে। এখন এখান থেকে আমার সরে যাওয়াই ভাল। কারণ তিনি তো জানেন যে আমি তাঁর অনুরাগী পাঠিকা নই। আমি থাকলে সনতের সঙ্গে তিনি মন-ঢালা আলোচনা করতে পারবেন না।

আস্তে আস্তে আমি উঠে দাঁড়ালাম। একটু দূরে দরজার পর্দা কেমন করে জানি না অনেকটা সরে গিয়েছিল। সেটা টেনে দেয়ার ভান করে আমি এগিয়ে গেলাম। তারপর সরে এসে লেকের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেলিং-এর ওপর দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ।

হাওয়ার গতিতে এক আশ্চর্য কম্পন ছুটে ছুটে আসছে। তার স্পর্শে সির সির করে ওঠে শরীর। আমি আমার মা-র মত সুন্দর হলাম না কেন ?

আমার এই দেহ হঠাৎ কি আভা-ছড়ানো বহুমূল্য এক প্রদীপের মতো কেঁপে উঠতে পারে না ? বাতাসে ভেসে আসা যে কম্পনের অনুরণন আমার মনে বেজে উঠছে, দেহ দিয়ে তা প্রকাশ করবার বিদ্যা কে আমায় শিখিয়ে দেবে !

আমি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাব। গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাব। আমার দেহের পরমাণু বাতাসে ভেসে-ভেসে খুশির ঝলক আশ্চর্য এক গতিতে বিলিয়ে-বিলিয়ে চলে যাবে অনেক—অনেক দূর—যেখানে আজও পৌঁছতে পারে নি এই পৃথিবীর কোন মানুষ।

বুদ্ধ মন্দিরে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজছে !

পাঁচ

ও আবার আসবে।

লৌকিকতার কোন সেতু পার হবার চেষ্টা করবে না কৃত্রিম কৌশলে। চাকরির আশায় এসেছিল প্রথমে। চাকরির চেয়ে বড় কিছু পেয়ে গেল না চাইতেই। এখন নিদারুণ দৈন্যের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করবে আর যেহেতু আমি আছি মাঝখানে তাই মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করতে বেধে যাবে ওর। ও মরবে। তবু বিসর্জন দেবে না ওর অহঙ্কার।

ওর এখন কোন কাজ নেই। তাই যখন-তখন এখানে আসে। মা-র সঙ্গে জোরে-জোরে কথা বলে অনেকক্ষণ। পত্রিকার বিষয় পরামর্শ করে। আমি সব সময় ওর সামনে যাই না। মার সামনে ওর সঙ্গে কথা বলতে সঙ্কোচ হয়।

সনৎ এলে মা-ও আমাকে কখনও ডাকেন না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি জেনেও আমাকে কোন উৎসাহ দেন না। বিজয়কেতনের সামনে যেমন সাজিয়ে-গুজিয়ে আমাকে জোর করে ঠেলে দিয়েছিলেন তেমন এর সামনে কখনই যে দেবেন না সে কথা আমি জানতাম।

কিন্তু আমি সনতের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করতে চাই। আমার মনে এতদিনের জমা করা জিজ্ঞাসার যে পাহাড় মাথা তুলে আছে, শাবলের মতো ওর স্পষ্ট উত্তরের আঘাতে আমি এবার আস্তে আস্তে তা ভাঙতে চাই।

আজ না হোক, কাল হবে! এখন কিছুদিন মা-র সঙ্গে ও সাহিত্য নিয়ে খেলা করুক। তারপর হঠাৎ একদিন—যখন ও এই বাড়িতেই নিজেকে আবিষ্কার করবে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে সেদিন ওকে নিয়ে আমি কোথাও চলে যাব।

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

ও এসেছিল রোদে ঘামতে ঘামতে কড়া এক দুপুরে। আমি ওকে দেখতে পাইনি। বেয়ারা এসে মাকে খবর দিয়েছিল। তখন বারান্দায়ও রোদ প্রখর। মা নিচে নেমে এলেন। ড্রইংরুমে ওকে বসিয়ে কথা বলতে লাগলেন।

ভেবেছিলাম কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেব। কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। একটা বই-এর দু-পাতা পড়েই বন্ধ করে দিলাম। আমাকে কেউ ডাকছে না! আমি কেন নিচে যাব ওর সঙ্গে কথা বলতে! শুধু মার সঙ্গে কথা বলে ও যদি আনন্দ পায়—পাক। যদি শুধু পত্রিকা প্রকাশের তাগিদে ও এখানে আসে—আসুক। আমার সঙ্গে বুঝি ওর কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু হঠাৎ এক সময় ও পা টিপে-টিপে ওপরে উঠে এল। আমার দরজায় টোকা দিল, টক টক। আজ সারা দুপুর আমি যে ওর প্রতীক্ষায় বসে থেকেছি সে-কথা ও বুঝতে পারল কেমন করে!

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আয়নার সামনে দাঁড়ালাম এক মিনিট। পর্দার ফাঁক দিয়ে ও আমাকে দেখতে পেল।

ও দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, সাহিত্য সম্পর্কে আপনার কি কোনই উৎসাহ নেই?

কেন বলুন তো?

অনেকক্ষণ এসেছি—নিচে গেলেন না যে?

রসিকতা করবার সাধ হল আমার, আমি কখনও নিচে যাই না। আমার চোখ সব সময় ওপরের দিকে।

তাই নাকি? যাক, আপনি নিচে নামেন না বলে আমাকে বাধ্য হয়ে ওপরে উঠে আসতে হল—

আসুন। এই যে, একটা ছোট চেয়ার দেখিয়ে আমি বললাম, বসুন না এখানে—

আমি সনতের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম যে সে ভরা দুপুরে

একা আমার ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছে। এ জ্ঞান ওর হল কেন? কেন ও সহজ স্বরে আমাকে বলতে পারে না—আমি তোমার কাছে বিনা দরকারে এসেছি। প্রথমে এ বাড়িতে এসেছিলাম চাকরীর জন্যে—কিন্তু এখন তোমাকে দেখতেই আসি।

ভীতু। এতটুকু সাহস নেই ওর।

বসুন, একটু জোর দিয়ে আমি আবার বললাম।

শুনুন, জড়তা কাটিয়ে কথা বলল সনৎ, আমি এই অসময়ে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এলাম—

নেমন্তন্ন? কিসের?

না না, বাইরে কোথাও আপনাকে যেতে হবে না। কাল সন্ধ্যেবেলা এ বাড়ির ড্রইংরুমেই সকলে আসবেন।

কারা?

বাংলার নামকরা যত সাহিত্যিক।

তাই নাকি? আমি হেসে বললাম, কিন্তু ওঁদের সঙ্গে আমি কি কথা বলব?

কথা আপনাকে বলতে হবে না। ওঁরাই বলবেন। আপনি শুধু ধৈর্য ধরে শুনবেন।

যদি শুনতে ভাল না লাগে?

জোর করে ভাল লাগাবেন।

বেশ। কিন্তু হঠাৎ এ আয়োজন কেন?

বাঃ, এক বাড়িতে বাস করে কোনই খবর রাখেন না দেখছি—

কেউ যদি খবর না দেয় তাহলে এসব খবর জানব কেমন করে?

কেন, মিসেস মুখার্জি আপনাকে কিছু বলেন নি?

না তো। আর মা বলবেনই বা কেন? আমি তো আপনাদের মধ্যে নেই।

কেন যে নেই সে কথা আপনিই জানেন। কিন্তু থাকতে আপনাকে হবেই—

আপনাদের পত্রিকা কি সত্যিই বেরুচ্ছে ?

আপনাদের নয়, বলুন, আমাদের—

আগে দেখা যাক পত্রিকা কতদিন চলে !

বেশ, দেখবেন, অভিমানে সনতের গলার স্বরটা অন্যরকম শোনাল। বেচারি ! ওর এক ভয়ঙ্কর পরিণাম ভেবে হঠাৎ আমার শরীর হিম হয়ে গেলেও ওকে রক্ষা করবার দুর্দান্ত নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। বাবার কাছ থেকে একটা চাকরি ও সব থেকে আগে আদায় করে নিক।

আপনার চাকরির কি হল ?

মনের মতো কাজ তো পেয়ে গেছি, মাথার ওপর বড় পাখার দিকে তাকিয়ে সনৎ খুব আস্তে কথা বলল, আপনার নাম কিন্তু শেষ অবধি রাখা হল না—

আপনাদের পত্রিকার নাম ? হেসে আমি বললাম, যাক তবু নামটা্র মান বাঁচল।

মিসেস মুখার্জি বললেন, আপনি নাকি রেগে যাবেন—

ঠিকই বলেছেন, আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করতে দিলাম না সনতকে, রাগবারই তো কথা।

আমি এবার যাই, আমি কিছু বলবার আগেই সে উঠে দাঁড়াল, কাল ঠিক বাড়ি থাকবেন।

থাকব। কিন্তু এই রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

অনেক জায়গায়। ভয়ানক কাজ এখন আমার। একটা মনের মতো পত্রিকা যদি বের করতে পারি তাহলে সত্যি বলছি আপনাকে এ জীবনে আমার আর কিছু চাইবার নেই ?

একটা পা নাচিয়ে ঠাট্টার সুরে আমি বললাম, আর কিছুই না ? এত অল্পেই আপনি খুশি ? যাক গে, একটু বসুন।

বাধ্য ছেলের মত ও বসল আবার, অল্প নয়। খুব বেশি। জীবনে আমি শুধু একটি কাজই করতে চেয়েছিলাম। আর

আপনাদের সংস্পর্শে না এলে সেটা হয়তো কিছুতেই সম্ভব হত না—

কিন্তু এখনও কিছুই তো আরম্ভ হয় নি।

শেষ অবধি কিছুই যে হবে না—আপনি প্রথম থেকে এমন একটা ভাব নিয়ে বসে আছেন কেন?

জোরে নিশ্বাস ফেলে আমি বললাম, কি জানি!

আমার মার গালে কিংবা ঠোঁটে আজ কোন রঙের ছোঁয়া লেগে নেই। গায়ে সাদা একটা ঢাকাই শাড়ি—ডোরা-কাটা নম্র পাড়। সিঁদুরের পুরু টান। গলায় পাতলা একটা হার। হাতে কয়েকটা চুড়ি আর নতুন একজোড়া বালা। হাত-ঘড়িটাও পরেন নি তিনি আজ।

মাকে যেন আমি নতুন করে দেখলাম। ওঁকে দেখতে আমার ভাল লাগছে। ছেলেবেলার মতো ওঁর গলা জড়িয়ে আদর করে বলতে ইচ্ছে করছে, মা! এমন প্রাণ-খোলা ডাক জ্ঞান হবার পর আমি যেন ডাকতে ভুলে গিয়েছিলাম।

বাবা কিন্তু বেশ অসহায় বোধ করছেন। তাঁর চোখে মুখে যেন একটা ভয় ভয় ভাব। আজ যারা আসবেন সন্ধ্যের আগে-আগে এখানে তাঁদের সঙ্গে কি কথা বলবেন—কিছু বলতে পারবেন কি-না ভেবেই তাঁর অস্বস্তি!

মাকে একসময় তিনি বলেছিলেন, আমার কি দরকার আজ বাড়ি থাকবার? তোমরা গল্প কর—আমি বরং এখুনি ক্লাবে বেরিয়ে পড়ি?

তীক্ষ্মস্বরে ধমক দিয়ে মা উত্তর দিয়েছিলেন, একটু লজ্জা করছে না তোমার একথা বলতে? আমাকে রোজ থাকতে হয় না যখন তোমার আপিসের ওরা আসে?

না, পাইপ কামড়ে চোখ কুঁচকে বাবা বলেছিলেন, মানে সাহিত্যের আমি কি বুঝি?

কি বোঝ তুমি? কিন্তু একটু ভদ্রতা জ্ঞানও কি নেই তোমার? এত নামকরা লোক সব আসছে এখানে—

আর কোন কথা না বলে বিরস মুখে মা-র সামনে থেকে বাবা সরে গিয়েছিলেন। মা কিন্তু থামেন নি অনেকক্ষণ—জোরে জোরে বাবাকে শুনিয়ে বলছিলেন, কিছু করনি কোনদিন আমার জন্যে—কিছু না। একটা বাচ্চা ছেলে যখন দিনরাত আমার জন্যে খেটে দিশা পাচ্ছে না তখন দয়া করে একদিন সন্ধ্যেবেলা ড্রিঙ্ক না করে থাকলে কি খুব বেশি কষ্ট হয় তোমার?

ঠিক সময় সকলেই এলেন। সনৎ যেন এ বাড়িরই কেউ। একবার বাইরে যাচ্ছে—একবার ভেতরে আসছে। কেউ-কেউ আসছেন গাড়িতে, কেউ-কেউ ট্যাক্সিতে আর আর অনেকে ট্র্যামে-বাসে কিংবা পায়ে হেঁটে।

আমি আজ সনতের সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম থেকেই আছি ড্রইংরুমে। মা-র মত আমিও হঠাৎ নতুন একজন হয়ে উঠেছি। সকলের সঙ্গে আলাপ করছি। হাসছি। কথা বলছি। বেয়ারার হাত থেকে খাবারের ট্রে টেনে নিচ্ছি। মার পাশে পাশে ঘুরে চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করছি।

সবচেয়ে বেশি কথা বলছেন আমার মা। বাবা একদিকে চুপ করে বসে আছেন। মা আলাপ করছেন প্রত্যেকের সঙ্গে। তিনি কথায়-কথায় তাঁর পত্রিকা প্রকাশের কথা জানিয়ে দিলেন ওঁদের। ওঁরা কেউ বুঝতে পেরেছিলেন কিনা বলতে পারব না, কিন্তু মাকে আমি চিনি বলেই এই আন্তরিকতার ভান ছাড়িয়ে তাঁর চোখে অবহেলার চাপা দৃষ্টি আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

দৃঢ়স্বরে মা ওদের জানিয়ে দিলেন যে বর্তমান কালের সাহিত্যে কোন সৃষ্টি নেই এবং শুধু সেই কারণেই একটা পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতে চলেছেন এবং আশা করেন যে প্রত্যেকেই তাকে নানাভাবে সাহায্য করবেন।

একজন বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

আর একজন বললেন, বেশ বেশ।

দু-একজন হাসলেন। কেউ কেউ মাথা তুললেন না। চার-পাঁচজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলেন। আমি কি করি না করি জানতে চাইলেন কয়েকজন।

এমনি করেই সেদিনকার সভা ভঙ্গ হল।

সেদিন সকলে চলে যাবার পর খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন আমার মা। শক্ত করে সনতের একটা হাত ধরে বলেছিলেন, আজ আমার জন্যে তুমি যা করলে—এতদিন আর কেউ তা করে নি—আমার মধ্যে একটা ঘুমন্ত মানুষকে তুমি জাগিয়ে দিলে সনৎ—

বিনয়ের হাসি হেসে সনৎ বলেছিল, কি যে বলেন!

সত্যি, কি চমৎকার লোক ওঁরা সকলে—এমন প্রাণ খুলে আমি আর কোনদিন কথা বলি নি।

সনৎ চলে যাবার অনেক পর ডিনার-টেবিলে এসে মা হাসতে লাগলেন, হাউ ফানি!

বাবা মুখ তুললেন, কি?

ওই যারা আজ এসেছিল—মেয়েরা ঘরে গেলে কেউ উঠে দাঁড়ায় না। হুসহুস শব্দ করে চা খায়—আর ইংরেজি উচ্চারণ—এরা লেখক হয় কেমন করে?

বাবা কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, লেখক হতে বাধা থাকবে কেন? ওঁরা তো বাংলায় লেখেন—

মা বেশ জোরে বললেন, তুই থাম।

ছয়

মা-র পত্রিকা একদিন প্রকাশিত হল। নাম বলব না—কারণ দু-চার সংখ্যা হয়তো এতদিনে আপনাদেরও হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। সনতের সঙ্গে ভাল ভাল লেখকদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মা লেখা জোগাড় করেছেন। যত না লেখা পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছেন বিজ্ঞাপন। শুনছি শুধু বিজ্ঞাপন থেকে নাকি সাত-আট হাজার টাকা উঠবে।

আমি গাড়ি নিয়ে লেখকদের বাড়ি-বাড়ি গেছি। মা একদিন বাবাকে বলছিলেন, ধন্য হয়ে লেখকরা লেখা দিয়েছে। তবে দু-একজন ছোটলোকও যে ওদের মধ্যে নেই তা নয়—হাতে হাতে টাকা চায়। এত বিজ্ঞাপন পাব জানলে কে ছোটলোকদের বাড়ি যেত—ওই তো লেখার ছিরি।

উঃ সনৎ, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে মা তার দিকে ল্যাংড়া আমের প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, সকলের কাছে তুমি আমায় চিনিয়ে দিলে! আর বুঝলে—মিস্টার মুখার্জিকেও খুব জব্দ করতে পেরেছি এবার। ওঁর ধারণা আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারি না। কিন্তু এবার? আচ্ছা সনৎ, কত লাভ হল আমার প্রথম সংখ্যা থেকে?

সে তো আপনিই জানেন।

একটু ইতস্তত করে মা বললেন, এখনও ঠিক হিসেব করি নি। আঃ—কী যে ভাল লাগছে আমার! এ আমার নিজের রোজগারের টাকা।

আমি শুনতে পেতাম সনতের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। খেটে খেটে রোগা হয়ে গেছে। হয়তো এতদিনে ঋণের জালেও জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মা-র কাছ থেকে কি পাবে ও? ওর লেখার জন্যে মা কি ওকে টাকা দিয়েছেন?

বেশিক্ষণ মা আজকাল সনতের সঙ্গে কথা বলেন না। তাঁর এখন অনেক কাজ। ধুতি-শার্ট পরা একটা গরিব ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সব জায়গায় যেতে তাঁর লজ্জা হয়। দ্বিতীয় সংখ্যার সব আয়োজন তিনি একাই করবেন শুনছি।

আঘাত লেগেছে সনতের। মুখ শুকিয়ে গেছে। কিছু বলবার সাহস আছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হয়, হয়তো আমার জন্যেই নিজের অন্য কোন পাওনা ও মা-র কাছে দাবি করতে পারবে না। মূর্খ! ওর শরীরটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে আমি বলতে চাই, কেন? কেন? কেন তুমি তোমার নিজের পরিশ্রমের সব পারিশ্রমিক আর একজনকে ভোগ করতে দিচ্ছ? কি পেলে তুমি?

হ্যাঁ, একদিন—প্রথম আষাঢ়ের ভিজে-ভিজে থরো থরো এক সন্ধ্যায় কোন সঙ্কোচ না করে সে কথাটা সনৎকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন ওর এ-বাড়িতে আসবার কথা ছিল না। মাকে টেলিফোন করে ও আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মা ওকে বলেছিলেন যে, তিনি বাড়ি থাকবেন না। সনৎ যেন রবিবার সকালে আসে।

মা-র এই মিথ্যাভাষণে আমি অবাক হই নি। বাড়িতে বিরাট পার্টি সেদিন। মা কোথাও যেতে পারেন না। আর যাঁরা আসবেন আজ, তাঁদের সামনে সনৎকে উপস্থিত করতে হলে তিনি লজ্জায় মরে যাবেন।

তবু এল সনৎ। সেই এক পোশাক। বোধহয় মা থাকবেন না জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। কি একটা বলতে চায় ও আমাকে কয়েকদিন থেকে। চাপা আগুনের যে আঁচ ওর বুকের মধ্যে থেকে থেকে ঝিলিক মারছে, আমি যেন তাতে ইন্ধন জুগিয়ে যোজন-যোজন ব্যাপী এক বিরাট দাবানল সৃষ্টি করতে পারি। প্রেমের নয়—চেতনার।

কিন্তু সত্যিই কি আমার কাছে এসেছে সনৎ ?

ওকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠে মা বললেন, এ কি, তুমি যে হঠাৎ এলে সনৎ !

সনৎ উত্তর দেবার আগেই তর তর করে এসে মা-র সামনে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, আমি ওঁকে আসতে বলেছি।

মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, কেন ? আজ বাড়িতে—

আমার বিশেষ দরকার আছে, দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি ডাকলাম, আসুন সনৎবাবু—

মা-র দিকে না তাকিয়ে একটা যন্ত্রের মত বিষণ্ণ মূক সনৎ ওপরে উঠে এল আমার পেছনে পেছনে।

আকাশ থেকে এখন ভারী মেঘ সরে গেছে। ভিজে হাওয়ার জোরও কম। কপাল ঘামছে আমাদের দুজনের। কিন্তু সনতের চোখদুটো যেন স্থির। আশ্চর্য এক দৃষ্টি। ও যেন এ বাড়ির কোথাও নেই। কিসের লজ্জায় ওর শরীর কাঠ হয়ে গেছে। কথা বলবার ভাষাও বোধহয় নেই।

সব নীরবতা ভেঙে দিয়ে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন ?

একটার পর একটা গাড়ি আসছে গেট পেরিয়ে। মাঝে মাঝে হর্নের শব্দ। দারোয়ান পায়ে পা ঠুকে সেলাম করছে। আনন্দের কলরব ওপরে ছুটে আসছে। আর ওপরে আমার পাশে বসে যেন হিম হয়ে যাচ্ছে সনতের শরীর। কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে ?

আমি জানতাম না যে আজ আপনাদের বাড়িতে—

বাধা দিয়ে বললাম, আপনি তো আমার কাছে এসেছেন। এসব পার্টিতে আমি নিজে কখনও যাই না, সে-কথা বোধহয় আপনি জানেন না।

বিমূঢ় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সনৎ বলল, কিন্তু মিসেস মুখার্জী কি ভাবলেন—ছি ছি !

কি আবার ভাববেন ? আমি তো বললাম মাকে যে, আমিই আপনাকে আজ আসতে বলেছিলাম।

কিন্তু আপনি তো বলেন নি।

ও কথা থাক, কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, মা আপনাকে টাকা দিয়েছেন ?

টাকা ? কিসের ?

পত্রিকার লাভের ভাগ ?

মুখ নামিয়ে নিজের বাঁ হাতের নখগুলোর দিকে চেয়ে সনৎ বলল, না না—

আপনি চেয়ে নেন নি কেন ? উনি যখন দিলেন না, তখন তো তাঁকে বলা উচিত ছিল !

কি বলব আমি ?

ঝাঁজের সঙ্গে আমি বললাম, আপনাকে বলতে হবেই। আপনি কোন যুগে বাস করেন যে, নিজের পারিশ্রমিক চাইতে লজ্জা পান ?

একটু-একটু করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল সনত, কিসের পরিশ্রমিক ? তেমন কোন কথা ওঁর সঙ্গে তো ছিল না আমার—কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি।

কি !

আমি যেমন চেয়েছিলাম তেমন পত্রিকা এটা হল না। ব্যবসা ছাড়া ওঁর আর কোনদিকে চোখ নেই। ওঁর কাছ থেকে আমি ঠিক এটা আশা করতে পারি নি—

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কি আশা করেছিলেন ?

নতুন একটা সুর—আমি আপনাকে এখন সে-কথা ঠিক বোঝাতে পারব না।

আমি বুঝেছি।

কি জানি!

বিশ্বাস করতে পারছেন না?

জানি না, সনৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই।

না। আর একটু বসুন।

কেন?

আপনার ইচ্ছেমত একটা পত্রিকা বের করতে পারবেন?

তা সম্ভব নয়।

কেন?

দেখুন, আমাকে আর এ-সব কথা বলবেন না, দীর্ণস্বরে সনৎ বলে উঠল, আমি ক্লান্ত, নিঃস্ব, ফুরিয়ে গেছি—

না, সনৎ না, আমি গায়ের জোরে সেই অন্ধকারে ওর হাত চেপে ধরলাম, বঞ্চনার এই স্বাভাবিক তুচ্ছ আঘাত ফুরিয়ে গেলে চলবে কেন?

আমাদের মত মানুষ এমনি করেই তো ফুরিয়ে যায়—

হ্যাঁ, অত জোরে আমি কোনদিনও কথা বলি নি, যারা তোমার মত মূর্খ তারাই এমনি করে পড়ে-পড়ে মার খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। কেন তুমি প্রথম থেকে সতর্ক হতে পার নি?

জানি না।

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে আমি আমার গলার স্বর সংযত করে নিলাম, কিন্তু এবার সব জেনে-শুনে তোমাকে আর একটা পত্রিকা বের করতে হবে।

অসম্ভব—অসম্ভব। টাকা নেই আমার। শুধু সামর্থ্য দিয়ে এগুনো যায় না। তুমি বুঝতে পারছ না।

খুব বুঝতে পারছি। সামর্থ্য দিয়েই সব হয়। টাকা এবার মা দেবেন না—আমি দেব।

তা কি হয়। উনি কি ভাববেন?

সেটা আমাদের ভাববার কথা নয় সনৎ—না না, তাকে দেখতে

দেখতে আমি বললাম, এতে ভাবনার কিছু নেই। তুমি তো প্রথম-দিন পত্রিকার ব্যাপারে আমার সাহায্য চেয়েছিলে—এবার আমি সত্যি পরিশ্রম করব তোমার সঙ্গে। বল, এখুনি ঠিক করতে হবে পত্রিকার নাম, বল—

সনতের মুখ থেকে যেন ফসকে বেরিয়ে এল, শ্রীমতী—

না, ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত নাম বল সনৎ? অন্য কোন নাম?

আমার দিকে অবাক হয়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল সনৎ, অন্য কোন নাম?

হ্যাঁ।

তাহলে আজ নয়—আর একদিন হবে। আজ শ্রীমতী নামটাই চারপাশে গুঞ্জন করে ফিরুক।

ফিরুক। মুখে কিছু বলতে পারলাম না, মনে মনে বললাম, ফিরুক আমার নাম গুঞ্জন করে তোমার শ্রবণ ঘিরে। আমারই জন্যে তুমি বঞ্চিত—তুমি নিঃস্ব—আমারই জন্যে তুমি আমার মার কোন আচরণের কোন প্রতিবাদ জানাও নি।

কিন্তু সে কথাটা যে আমি অনেক আগেই বুঝেছি তা হয় তো কোনদিনও ওকে আমার জানানো হবে না। আজ বোধহয় প্রথম অদ্ভুত এক রহস্যের স্বাদ আমার মনে লেগেছে। একটা জাল ছড়িয়ে ছড়িয়ে আমি ওকে আমার সব কিছু দিয়ে ঢেকে রাখতে চাই—রক্ষা করতে চাই। আর নিবিড় রহস্যের চঞ্চল অতলে মিলিয়ে যেতে চাই।

সনৎ আমার কে!

বুদ্ধি দিয়ে ওকে আমি গ্রহণ করেছি বলে খুঁজে পেয়েছি নিজের দ্বিধাহীন মন। আর হৃদয় দিয়ে ও আমাকে চেয়েছে বলে ইচ্ছে করে ঠকেছে—অপচয় করেছে অনেক সময়। আমি আছি বলেই আমার মা-র সব অত্যাচার ও সহ্য করেছে।

এখন ও হৃদয় দিয়েই আমাকে গ্রহণ করুক আর আমি বুদ্ধি

দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে চলি। আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম আমি সনতের মুখের ওপর। কী আশ্চর্য পরিবর্তন! ক্লান্তি আর পরাজয়ের শেষ রেখাটাও বুঝি ওর কপাল থেকে মিলিয়ে গেছে। উজ্জ্বল এক আভার ছটায় ও যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে।

বাইরে থেকে আলোর অনেক রেখা এসে পড়েছে ঘরে। আলো জ্বালাবার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলেও হয়তো এই থরো থরো মুহূর্তগুলোর ছন্দ কেটে দিয়ে আলো জ্বালাবার ইচ্ছে হত না আমার। চাপ-চাপ হলুদ-সোনা অন্ধকারে আমি আমার রোমকূপ দিয়ে পারহীন রহস্যের বিপুল স্বাদ গ্রহণ করতাম। বুকের পাঁজরে পাঁজরে অনেক কথার ভিড়।

কিন্তু কি কথা বলব এখন আমি ওর সঙ্গে!

শ্রীমতী! মৃদু নরম একটা ডাক।

বল?

তুমি কখনও পাহাড় দেখেছ?

দেখেছি।

তুমি কখনও সমুদ্র দেখেছ?

আমি একই উত্তর দিলাম, দেখেছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সনৎ। জানলা দিয়ে বাগানের বড় বড় গাছের দিকে তাকাল একবার। আমাকে দেখল। এলোমেলো ভিজে বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল দুজনের চোখে-মুখে। যেন হঠাৎ মহাজীবনকে পেয়ে গেছি আমরা। হাওয়ায় মাটির গন্ধ এসে লাগছে নাকে।

সমুদ্র এখান থেকে কতদূর!

থেমে থেমে কী দৃঢ়তায় বলে ফেলে সনৎ, আজ তুমি এক আশ্চর্য দৃষ্টি দিলে আমায়—পাহাড় আর সমুদ্র যেন অলৌকিক প্রভাবে আমার চোখে এক হয়ে গেছে—

কিছু একটা আমিও বলতে চেয়েছিলাম ওকে। পারি নি।

আলোর রেখা আর অন্ধকার, ভিজে হাওয়ার ঝলক আর মাটির ঘ্রাণ আর নীল-নীল আকাশের তারার মুহুর্মুহু কম্পন আজ যেন অনেক নতুন ফুল ফুটিয়েছে আমার ভাষার অরণ্যে। কথা বললেই এক-একটি পাপড়ি খসে যাবে। তাই কথা বলতে আমার সঙ্কোচ। আমি একা-একাই নির্জন গহনে ফুটে ওঠা অসংখ্য ফুলের শোভা দেখব।

কি ভাবছ?

ওর প্রশ্নের উত্তর দিলাম না আমি। একবার শুধু মার কথা ভাবলাম। কিন্তু আমি জানি এখন ওপরে আসবে না কেউ। একটা বেয়ারাও নয়। রূঢ় নির্লজ্জ উৎসব এখন বাড়ির বাকি মানুষগুলোকে ড্রইংরুমের আশে পাশে টেনে রাখবে।

নিচে যাবে?

চঞ্চল হয়ে সনৎ উঠে দাঁড়ায়, অনেক দেরি হয়ে গেল—আমি আজ যাই—

আমি হেসে বললাম, একটু ভুল করছ, আমি তোমাকে সময়ের কথা মনে করিয়ে দিই নি। আমি বলছিলাম মা-বাবার পার্টিতে যোগ দিতে চাও নাকি?

না, কি ভেবে বলল সনৎ, আমাকে তো কেউ নিমন্ত্রণ জানায় নি।

হঠাৎ আমি জোরে হেসে উঠলাম, আমার কিন্তু আজ ওই পার্টিতে যেতে খুব ইচ্ছে করছে।

আস্তে সনৎ বলল, যাও না।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম আমি—যেন আমার চোখে বন্য উল্লাসের ছায়া ও দেখতে না পায়। সাংঘাতিক একটা কিছু করবার আকাঙ্খা দুর্বার হয়ে উঠেছে আমার মনে। হ্যাঁ, আজ আমার কোন আপত্তি নেই—দ্বিধা নেই।

মা-বাবার পার্টিতে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে আমি ওদের মতো হো-হো করে হাসতে পারি—তুচ্ছ আলোচনায় কাটাতে পারি ঘণ্টার পর

ঘণ্টা। আর সেখানে যা কিছু সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তা হাতের এক ঝাপটায় তছনছ করে আসতে পারি।

সত্যি যাব নাকি এখন একবার নিচে!

কিন্তু আশ্চর্য, আমি এতক্ষণ সনৎকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলও খাবার কথা বলিনি। উত্তেজনায় অন্ধ হয়েছিলাম ও আসবার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর অনুভূতির কম্পনে সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

আমি এখুনি আসছি।

পার্টিতে যাচ্ছ? আমি আজ যাই—

না। বসো। আমি এক মিনিটে ফিরে আসছি।

একা এখানে বসে থাকতে বোধহয় অস্বস্তি হবে সনতের। তাই ও আমাকে আবার জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

তোমার চায়ের ব্যবস্থা করে আসি—

বাধা দিয়ে ভারী স্বরে ও বলল, না!

কেন? কিছু খাবে না?

না।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। সুইচ টিপে এবার আলো জ্বাললাম। কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠেছে সনতের। ঠিক এই মুহূর্তে যেন জ্বলন্ত প্রতিবাদের মতো মনে হচ্ছে ওকে। হ্যাঁ, ও যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। আর ওকে জাগিয়ে দেয়ার গর্ব আমার একার।

ওর জেদ জোর করে ভেঙে দিতে চাইলাম আমি। চেতনার যে বীজ আমার জন্যে আজ ও নিজের মনে খুঁজে পেয়েছে তাকে রসে রসে পল্লবিত করে তুলুক। আমাকে একদিন পাবার আশায় নিঃশব্দে প্রবঞ্চনার সে-সুযোগ দিয়েছে আমার মাকে—এবার আমাকে পেয়ে তার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিক।

তোমার সঙ্গে আবার আমার কোথায় দেখা হবে শ্রীমতী?

তুমি আর এখানে আসবে না ?

না—কোনদিনও না।

আমি জানতাম।

চমকে সনৎ জিজ্ঞেস করল, কি জানতে তুমি ?

হঠাৎ একদিন এ বাড়িতে আসা তুমি বন্ধ করবে, একটু ইতস্তত করে আমি বলতে চাইলাম, আর সেদিন—

কি ?

অন্য আর এক জগতের দরজা আমার জন্যে খুলে যাবে, মুখ নামিয়ে নিলাম আমি। ওর দিকে তাকাতে পারব না। কিন্তু ও দেখুক আমাকে। এবার ও কথা বলুক। আমাকে দিয়ে জোর করিয়ে কথা বলিয়ে নিক।

কোথায় দেখা হবে তোমার সঙ্গে ?

বল কোথায় ?

সনৎ বলল, একটু ভেবে বলব।

তোমার বাড়িটা কোন জায়গায় ?

না না, সেখানে তুমি যেও না—

কেন ?

অপরিচ্ছন্ন ছোট একটা মেস—

আমার ভাল লাগল না ওর কথা। কেন এখনও ও নিজের সব কিছু আমার সামনে মেলে ধরতে লজ্জা পায়! লজ্জায়-লজ্জায় এতদিন তো নিজেকে ক্ষয় করেছে তিলে-তিলে। যদি ওর বাইরের জীবনে কোন দৈন্য থেকে থাকে তার জন্যে কি ও নিজে দায়ী ? বিরাট দৈন্যের বোঝা কারা ওর ওপর জোর করে চাপিয়ে রেখেছে ?

কেন লজ্জা পায় সনৎ আমার কাছে।

তুমি যেখানে থাক সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে কেন লজ্জা পাও ? বোধহয় আমার গলার স্বর ভিজে ভারী হয়ে উঠেছিল।

লজ্জা নয় শ্রীমতী, বিচলিত হয়ে সনৎ বলল, আমি এখন যেমন

ভাবে থাকি তেমন ভাবে কারুরই থাকা উচিত নয়, তাই আমার ঘরের সেই চেহারা আমি তোমাকে দেখাতে চাই না।

এ ভাবে তোমার থাকা উচিত নয় তবু তুমি আছ—তুমি থাকতে বাধ্য হচ্ছ—এ কথাটা যখন বুঝতে পেরেছ তখন সে-ঘর আমি দেখতে চাইলে চমকে ওঠ কেন?

তেমন জায়গা তুমি কখনও দেখ নি বলে, একটু থেমে বলল সনৎ, আর তেমন ঘর যেন কখনও তোমাকে দেখতে না হয়—

আমি সজল এলোমেলো হাওয়ার মাতামাতি ছাড়িয়ে ওর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু হঠাৎ জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করল আমার। কেন ওর এই সঙ্কোচ! হ্যাঁ, হবেই। হয়তো আমাকে ও মনে করবে আমারই মায়ের মতো। নিজের ওপর মানুষের জোর করে চাপানো দৈন্যের বোঝা লুকিয়ে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টায় হিমসিম খাবে আর রাতারাতি আমাকে খুশি করবার জন্যে সুড়ঙ্গপথ ধরে আর সকলকে ভুলে কেবলই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে ভুয়ো সার্থকতার সবচেয়ে উঁচু চূড়ায়।

কিন্তু আমাকে চিনতেই হবে ওর। কারণ আমি ওকেই চিনেছি। আমি ওকেই দেখেছি। ওর বাড়ি দেখি নি। আমার চোখের সামনে আমি শুধু দেখেছি একটি শান্ত সরোবর। আর পার্থিব লাভ-লোকসান দিয়ে আমার মা কিম্বা আমারই সমবয়সী আজকের আর পাঁচজন মেয়ের মতো প্রেমকে কোন শর্তের অধীন করে তুলিনি। সেই শান্ত সরোবরে তাকে আমি ফুটে উঠতে দিয়েছি বৃহৎ এক পদ্মের মতো। আজ এই প্রস্ফুটন হয়তো আমার একার গর্ব।

কিন্তু আমার স্বরে ঝাঁজের সামান্য রেশও রইল না, আমি তোমার ঘর দেখবই।

যদি ইচ্ছে হয়, দেখো।

হ্যাঁ, দেখব, বলবার দরকার না থাকলেও আমি আজই বলে

ফেললাম, কোনদিন তোমার কোন কিছু তুমি আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে যেও না।

না। শ্রীমতী তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। দৈন্য গোপন করবার চেষ্টায় আমি তোমার কাছে নিজেকে আরও দীন করে তুলতে চাই নি—

তাহলে ?

এতদিন—আমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এমন জীবন কাটাতে হচ্ছে—নিজের এই অক্ষমতার কথা আমি শুধু তোমাকে জানাতে চাই নি।

হালকা স্বরে বললাম, ভুলে যেও না তোমার অনেক অক্ষমতার কথা আমি জানি।

এবার আমার ক্ষমতার কথাও তুমি জানবে।

জানব বলেই তো নতুন পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে তোমাকে। বাইরে বোধহয় ঝির ঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অল্প-অল্প জলের ঝাঁট আসছে ঘরে। কিন্তু জানালা বন্ধ করে দেয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি সনৎকে বললাম, আর এক পত্রিকা প্রকাশ করে শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে তোমাকে।

দেব, কোন ক্লান্তি নেই তার স্বরে, আমি জানি সম্পাদনার কোন গ্লানি এবার আর আমাকে যন্ত্রণা দেবে না।

এর আগেও যন্ত্রণা পেতে না সনৎ, আমি খুব আস্তে আস্তে কথা বললাম, ইচ্ছে করেই শুধু শুধু ঠকে মরলে—

ও হাসল, ঠকে মরেছিলাম বলেই তো আজ আবার নতুন করে বাঁচতে পারলাম। শুধু লাভের কথা ভাবলে হয়তো শেষ অবধি লোকসানই হয়।

এখন কিসের কথা ভাবছ ?

যা ভাবছি তা ভাষায় সাজাতে গেলে হয়তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—হারিয়ে যাবে—

আমি শুধু অস্ফুট গুঞ্জন করে উঠলাম, তবে বলো না।

নীরব থাকার পালা আমারও এসেছিল একটু আগে। এখন এসেছে ওর। থাক ও চুপ করে যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ। মনের মধ্যে আমারই মতো বিচরণ করুক এক মণিময় পরিধিতে। আর আমাকে দেখুক। আমিও দেখি ওকে।

দেখতে দেখতে সব কোলাহল থেমে যাক। এ বাড়ির এক-তলায় এখন যা ঘটছে আমরা দুজন যেন তার থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছি। আরও ওপরে উঠে যাব। সুলভ একটা ছায়া কোনদিনও কাঁপবে না আমাদের চোখের সামনে। এবার সত্যিই বুঝি আমার মুক্তি আসবে।

কিন্তু হঠাৎ কার পায়ের শব্দ আমারই ঘরের সামনে। কে আসে এখন এখানে। কারুরই তো আসবার কথা নয়! চমকে উঠে আমি বাইরে তাকালাম। সনৎও। বোধহয় আমার মা আসছেন মনে করে সনৎ একটু বিচলিতও হল।

মা নয়। বেয়ারা। হাতে নানা রকম খাবারের ট্রে! এক দৃষ্টিতে আমি দেখে নিলাম—ফ্রায়েড রাইস, মাংস, কাটলেট আর স্যালেড। যত্ন করে সাজিয়ে মা পাঠিয়েছেন সনতের জন্যে। তবু আমি বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কার?

সনতের দিকে তাকিয়ে বেয়ারা বলল, আপনার—

আমাকে কোন কথা বলবার অবসর দিল না সনৎ। বেয়ারার কথা শেষ হবার আগেই জোর গলায় বলে উঠল, আমি কিছু খাব না, এসব এখান থেকে নিয়ে যাও!

সনতের কথা শুনে স্তম্ভিত বেয়ারা হঠাৎ ঠিক করতে পারল না কি করবে। আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। আমি তাকে হাতের ইসারায় ট্রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললাম। কিন্তু আমি জানি, মা এখন কিছুতেই ওপরে আসবেন না। তাঁর সন্ধ্যার অন্য রকম চেহারা ইচ্ছে করে তিনি সনৎকে দেখাবেন না।

বেয়ারা চলে গেলে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু খেলে না যে? মা ট্রে সাজিয়ে খাবার পাঠালেন তোমার জন্যে—

হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল সনৎ, ওসব খাবার আজ আমার জন্যে তৈরি হয়নি বলেই খেলাম না, হাসি থামিয়ে ও বলল, তা ছাড়া পার্টি এখনও চলছে—বাইরে বসে পার্টির খাবার চোরের মতো আমি খেতে যাব কেন?

মা-র ব্যবহার দেখে আমারই লজ্জা করছিল সনতের সামনে বসে থাকতে। ওকে উনি কিছু না পাঠালেই তো পারতেন। তবুও খুশি হলাম আমি সনতের প্রত্যাখ্যান দেখে। আশা করি ওকে আর বেশি সতর্ক করবার প্রয়োজন নেই।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্যে বললাম, আজ তুমি কার কাছে এসেছিলে?

তোমার কাছে, কারণ আমি ভেবেছিলাম মিসেস মুখার্জি বাড়ি থাকবেন না—

কিন্তু মা বাড়িতে আছেন বলে সব দিক থেকে ভাল হল—তাই না?

আমার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে সনৎ জিজ্ঞেস করল, কেন একথা বলছ?

মা-র সম্বন্ধে তুমি যতটুকু জানতে আজ তার চেয়ে অনেক বেশি জানতে পারলে—

না জানলেও আমার কোন ক্ষতি হত না শ্রীমতী। আজ আমি তোমার কাছে নিজেকে জানাতে পারলাম—এটাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ। এখন আমাব আর কোন ক্ষোভ নেই।

যদিও পাখা চলছে মাথার ওপর কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে অনেকক্ষণ থেকে। অল্প-অল্প বৃষ্টি এখনও পড়ছে কিনা ঘরে বসে বোঝা যাচ্ছে না। সনৎ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। এবার ওর যাবার সময় হয়েছে।

ঠিকানাটা আমার কাছে রেখে যাও।

তুমি কি সত্যিই যাবে আমার মেসে ?

যাই-না-যাই, দরকার হলে দু-এক লাইন চিঠি তো লিখতে পারি।

দু-এক লাইন নয়, অনেক বড় চিঠি লিখো।

আমি হেসে বললাম, দেখা যাবে।

নিজের ঠিকানা দিল সনৎ, আমাদের পত্রিকার অফিসটা কোথায় হবে ?

এ বাড়িতে নয় নিশ্চয়ই, এক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, আমি একটু ভেবে তোমাকে জানাব।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সনৎ। আমিও গেলাম ওর পেছন পেছন। সে কোনদিকে তাকাল না। দ্রুত পায়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। এখন বৃষ্টি নেই। কিন্তু ভিজে উঠেছে চারপাশ। মাথার ওপর আকাশও পরিষ্কার নয়। সামনের রাস্তায় সারি-সারি নীল আলো জ্বলছে।

আমি যাই।

গেট খুলে সনৎ বেরিয়ে গিয়ে পড়ল বড় রাস্তার ওপর। বাস স্টপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম গেটের কাছে। ও বাসে উঠল। হাত নাড়ল। শব্দ করে দ্রুতগতি বাস মিলিয়ে গেল আমার দৃষ্টির আড়ালে।

কিন্তু তবু আমি গেটের কাছেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্কেত এসেছে এবার। হ্যাঁ, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব। পারবই। সারাদিন বিরুদ্ধ পরিবেশে আমাকে নিজের সঙ্গে আর সংগ্রাম করতে হবে না। দম বন্ধ করা অস্বস্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়তে হবে না। আমি নিজে বাঁচব। আর একজনকে বাঁচাব।

আমি বুঝতে পারি নি যে মা আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। এক ফাঁকে বোধহয় ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে আমি আর

সনৎ গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি যখন তার পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছিলাম তখন মৃদুস্বরে আমাকে তিনি কাছে ডাকলেন।

এতক্ষণ ধরে সনৎ কি বলছিল তোকে ?

মা-র কৌতূহল দেখে আমি চমকে উঠলাম। হঠাৎ ঠিক করতে পারলাম না কি উত্তর দেব তাঁর কথার। আসলে সনতের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছে তার এক বর্ণও আমি এখন মাকে জানাতে পারব না—জানাতে চাই না। কিন্তু মিথ্যা কিছু বানিয়ে বলবার ইচ্ছেও আমার নেই।

তুই আজই ওকে আসতে বললি কেন ?

অদ্ভুত করুণ শোনালো মা-র গলার স্বর। কান্না-কান্না। ভিজে-ভিজে। আমি মা-র মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলাম না হঠাৎ তিনি ভেঙে পড়লেন কেন। কিন্তু প্রশ্নও করতে পারলাম না তাঁকে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন, ও কিছু খেল না কেন ?

আমার সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর একটা আগুন ধরে উঠতে চাইলেও আমি নিজেকে সামলে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, ক্ষিধে ছিল না বোধহয়—

ওর সব সময় ক্ষিধে থাকে।

না মা, তাঁর অবহেলার ঠাণ্ডা প্রকাশ আমি উষ্মা দিয়ে ঘুচিয়ে দিলাম, থাকে না। আর থাকলেও কারুর এঁটো খাবার দিয়ে সে কখনও ক্ষিধে মেটায় না।

কি বলতে চাস তুই শ্রীমতী ?

কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, এখনও পার্টি শেষ হয় নি—তুমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছ ?

শ্রীমতী—মা চাপা আক্রোশে পুড়তে-পুড়তে যেন ডাকলেন।

কিন্তু তাঁর কথা শোনবার জন্যে আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম না। প্রায় ছুটতে ছুটতে ওপরে নিজের ঘরে চলে এলাম। আজ আমি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না। তর্ক করতে চাই না। এ রাত থাক শুধু আমার একার ভাবনার জন্যে। মুক্তির একটা আশ্চর্য সুর আমার শরীর-মন জুড়ে নিবিড় অনুরণন জাগাক।

মা-র সঙ্গে তর্ক করে কেন আমি এ রাতের সৌরভ বিষিয়ে দেব আজ!

সাত

আমি আমার ছায়া দেখতে চাই। হঠাৎ কেন আমার এ ইচ্ছে—আমি জানি না। হয়তো আমি আরও অনেকের—মানে এই গোটা সমাজটার ছায়া আমার কোন এক নির্মম কাব্যের মধ্যে দিয়ে আপনাদের সকলকে দেখাতে চাই।

কিন্তু নিজের ছায়া দেখার কথা হঠাৎ আমার মনে জাগে কেন? আমি যেখানে আছি—সকাল থেকে রাত অবধি আমি যাদের দেখছি—যদি তাদের ছায়া ধরে রাখতে পারতাম কোন সরোবরে তাহলে হয়তো আরও দশজন খোলা চোখে তা দেখতে পারত। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠত। আর জ্বলতে জ্বলতে এই সমাজটাকেও জ্বালিয়ে দিতে পারত। আমাকে, আমার মা-বাবাকে আর—কিন্তু সে কথা এখন থাক। আগেই স্বীকার করেছি, আমি লেখিকা নই।

কেন আমি লিখতে জানি না! কেন আমি লিখতে পারি না! সত্যিই যদি আমার লেখবার ক্ষমতা থাকত তাহলে—হ্যাঁ, ছায়া নিয়েই আমি সারাদিন খেলা করতাম। কিন্তু আমি জানি, লিখতে না পারলেও আমি আমার মনের কথা সনৎকে জানাতে পারব। সে লিখুক—আমার সব অক্ষমতা সে তার প্রতিভায় ঢেকে দিক। তার জীবনে কম্পমান ছায়া হয়ে আমি দুলে উঠি। তারপর একদিন তারই মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে একেবারে শেষ হয়ে যাই। সে-পুড়ে মরাই যেন আমার মুক্তি!

ব্যতিক্রম বলে আমি কখনও গর্ব করব না। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না সে মেকী জীবনের ওপর আমার কোন লোভ নেই। আমি এখনও আমার কোন বন্ধু-বান্ধবের কথা উল্লেখ করবার সুযোগ পাই নি। আরও একটা কথা স্বীকার করি যে উল্লেখ করবার মতো কোন বন্ধুও আমার নেই।

শুধু একজনের কথা বলবার আমার এখন খুব বেশি ইচ্ছে করছে। আসল নাম বলব না। ধরুন, তার নাম প্রতিভা। বিয়ের আগে বহুবার সে আমাকে তার পূর্বরাগের কথা শুনিয়েছিল। কি আছে না আছে মণিময়ের—তার দীর্ঘ ইতিহাস। একবারও বলে নি যে মণিময় মানুষটি কেমন।

বলে নি—তার কারণ মানুষটি কেমন সে কথা তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে নি। যদি মণিময়ের ভাল চাকরি না থাকত কিম্বা ঐশ্বর্যের রঙ লেগে না থাকত তার দেয়ালে তাহলে হয়তো তাকে ভালবাসা অসম্ভব হত প্রতিভার পক্ষে।

তাহলে আজ নিছক ভালবাসার কথা আমি কার কাছে শুনতে পাব। আমি সর্বত্র শুধু শর্তের স্বাক্ষর দেখি—আর কিছু নয়। শর্তহীন এক মহাজীবন আমি কেমন করে পাব! পাব কি? হ্যাঁ, আমাকে পেতেই হবে।

সে-রাতে সনৎকে উপলক্ষ করে আমার ভাবনা কোন অফিসের দিকে ছুটে যেত আমি জানি না—যদি না সাধারণ সাদা একটা শাড়ি পরে আর অনেকক্ষণ বোধ হয় সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে মুখের কৃত্রিম রঙ তুলে ফেলে মা এসে আমার পাশে না দাঁড়াতেন।

সনৎ আবার কবে আসবে রে?

ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ যেন লাগল আমার গায়ে। কেন হঠাৎ সনতের ভাবনা ভেবে মা এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন! আর এখন তাকে তো তাঁর কোন প্রয়োজনই নেই। তবু লজ্জা হয়েছে মার। আজ যেন সনতের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেছেন।

আমি বললাম, ও কিছু বলে যায় নি।

কিন্তু—আবার চুপ করলেন মা। বাবার ঘরের দিকে একবার তাকালেন। অন্ধকার ঘর। পার্টির পরে বেশি কথা বলবার মতো অবস্থা থাকে না বাবার।

কি বল?

অতক্ষণ সনৎ তোর সঙ্গে কি গল্প করল ?

মা-র কৌতূহল একেবারে নিভিয়ে দেবার জন্যে নীরস স্বরে আমি উত্তর দিলাম, মনে নেই।

মনে নেই ? মা হাসলেন, ও বড় গরিব, না রে ?

অন্ধকারে মা বোধ হয় ভাল করে আমার সর্বাঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলেন না। দেখতে পেলে হয় তো চমকে উঠতেন। কারণ আমার চোখ ছুটো হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আমি তাঁর কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

মা কথা বললেন আবার, এত গরিব যে ওর জন্যে আমার মায়া হয়—

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আক্রোশে যেন আমার জিব ঠেলে বেরিয়ে এল, মায়ার কি মানে হয় মা ? ওর জন্যে কি করেছ তুমি ?

আমি আবার করব কি ? তোর বাবা কেন কিছু করল না সে কথা গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কর !

আমার কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। কিন্তু তুমি আমার কাছে ওর নাম করো না—

কেন ? ও কে যে—

ও কেউ নয়—কিছু নয়, হ্যাঁ, উচ্চারণে মনের সব কাঠিন্য মিশিয়ে আমি বললাম, কিন্তু ওকে তুমি মায়াই বা করতে যাবে কেন ?

তা ছাড়া আর কি করব ?

আর কিছু করনি এতদিন ?

কি করেছি ?

আমার মুখ থেকে শুনতে চাও ?

বল না ?

ওকে তুমি ঠকিয়ে এসেছ—

মা চীৎকার করে উঠলেন, শ্রীমতী !

সে কি না করেছে তোমার জন্যে? ছত্রিশ জায়গায় ছুটোছুটি —তোমার পত্রিকার দায় তার একার ঘাড়ে চাপিয়ে কি না তুমি করিয়ে নিয়েছ তাকে দিয়ে—

হঠাৎ নরম স্বরে মা ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সনৎ তোর কাছে এসব কথা বলেছে বুঝি?

না। এমন করে এত কথা সে বলতে জানে না তা তো তুমিও বেশ ভাল করেই জান—

তুই তাকে কিছু বলেছিস।

আমি এবার বললাম, বলেছি।

হঠাৎ কঠিন স্বরে মা আমাকে ধমক দিলেন, কি দরকার ছিল তোর এসব কথা আলোচনা করবার জন্যে আজ ওকে এ বাড়িতে ডেকে পাঠাবার?

এর জন্যে আমি ওকে ডেকে পাঠাই নি।

কিন্তু কেন ওকে আজ তুই আসতে বলেছিলি?

বিরক্তিতে আমার চোখ দুটো ছোট হয়ে এল। আজ আমি কারুর সঙ্গে কোন আলোচনা করতে চাই না। আমি যেমন নিজেকে খুঁজছিলাম—নিজেকে দেখছিলাম—একটা কম্পমান ছায়া নিয়ে মনে মনে খেলা করছিলাম—তেমন করেই বর্ষার ভিজে-ভিজে রাতটা যদি শেষ হয়ে যেত তাহলে বোধহয় আমার এতদিনের জমা করা গ্লানি আর অস্বস্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত মন থেকে। কিন্তু সে কথা মাকে আমি বোঝাতে পারছি না কিছুতেই।

অলস একটা ভঙ্গি করে আমি বললাম, তুমি সনতের কাছ থেকেই সব কথা জেনে নিও—

বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে মা বললেন, কি এমন কথা যে তা শোনবার জন্যে ওকে আমার দশদিন ধরে সাধাসাধি করতে হবে?

তাহলে আমাকেই বা বার বার জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি আজ কোন কথাই তোমাকে বলতে পারব না।

বলিস না, মা গম্ভীর স্বরে যেন আদেশ দিলেন আমাকে, কিন্তু যখন-তখন অমন একটা ছেলেকে আর পাঁচজনের সামনে আমাকে না জানিয়ে আর কখনও আসতে বলিস না।

অন্য সময় হলে হয়তো অবাক হয়ে যেতাম। মা-র স্বরূপ আবিষ্কারের উৎকট যন্ত্রণায় ছটফট করতাম। কিন্তু আজ কোন প্রতিক্রিয়াই হল না আমার মনে। আমার লেখিকা-সম্পাদিকা মাকে আমি আলো জ্বেলে একবার ভাল করে দেখতে চাইলাম। আরও ভাল করে চিনতে চাইলাম—বুঝতে চাইলাম।

আগেই বলেছি মাকে মাঝে মাঝে আমি বুঝতে পারি না। আমার এক-একবার মনে হয় তিনি যেন নিরুপায় হয়ে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন এক উগ্র কঠিন বিরুদ্ধ পরিবেশে। আমি যেমন এক কথায় এ বাড়ির সব প্রভাব এড়িয়ে দূরে চলে যেতে পারি—মা তেমন পারেন না। আর পারেন না বলেই কোন-কোন রাতে তাঁর ঘুম আসে না। তখন দিশা হারিয়ে কেঁদে কেঁদে বাবাকে আক্রমণ করেন।

আজ মা-র উক্তি শুনে নিজেকে সংযত করে খুব শান্ত স্বরেই আমি বললাম, পাঁচজনের সামনে তুমি যদি সনৎকে বার করতে না পার তাহলে তাকে এখানে কেন আসতে বলতে ?

হঠাৎ আমার কথার উত্তর দিতে পারলেন না মা। একটু ইতস্তত করলেন। মেঝেতে পা ঘষলেন কয়েকবার। খস খস শব্দ হল। ভারী স্বরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুই আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাস ?

না, আমিও গম্ভীর স্বরে বললাম, আমি শুধু ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাই।

আমি তাকে এ বাড়িতে আনি নি, আমার কাছে হার স্বীকার করবার ভয়ে মা বেশ জোর দিয়ে বললেন, তোর বাবা এনেছেন। তোর যা বলবার তাঁকে গিয়ে বল।

তোমাদের কাউকেই আমার বলবার কিছু নেই মা। শুধু মাঝে মাঝে তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না কিনা—যাক, সনৎকে নিয়ে তোমার ভাবনা করবার দরকার নেই, একটু চুপ করে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, সে বলে গেছে যে এ বাড়িতে আর কখনও আসবে না।

ভেবেছিলাম যে মা-র ঝাঁজ একেবারে জুড়িয়ে যাবে। সনৎ কেন আসবে না আর সে কথা ঠাণ্ডা স্বরে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। আর যদি কথায়-কথায় আমি নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে না পারি তাহলে সনতের হয়েই মা-র ওপর কঠিন আক্রমণ চালিয়ে যাব। তাঁর ভান আর দম্ভ যুক্তির ধারালো ছুরি দিয়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলব।

কিন্তু আমার কথা শুনে মা এতটুকুও বিচলিত হলেন না। আমাকে চমকে দিয়ে বেশ জোরেই হেসে উঠলেন, না, আসবে না। আর না এলে কি ক্ষতি হবে আমার। না ডাকতেই আমার বাড়িতে সব বড় বড় লেখক এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে না?

না। তুমি যাঁদের চাও তাঁরা কেউ আসেন না।

আসেন না? তুই সব জানিস—

যাঁরা আসেন, আমি বাধা দিয়ে মাকে বললাম, তাঁরা তোমার পত্রিকা নিয়ে মাথা ঘামাতে কিম্বা তোমার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা করতে আসেন না মা—

তাহলে কেন আসেন শুনি? আমাকে দেখে, তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে আর চারপাশের সব কিছু দেখে ওরা ধন্য হয়ে যায়।

তা হয়তো হয়—আমি ঠিক জানি না। ওঁরা বাবার কাছে চাকরির জন্যেই আসুন বা তোমার সঙ্গে গল্প করতেই আসুন—একমাত্র সনৎ তোমার সঙ্গে শুধু সাহিত্যের কথা বলতে আসত—

বলবে আবার কি? ও কি আমার চেয়ে বেশি জানে?

দেখ মা, অন্ধকারে মা দেখতে পেলেন না কিন্তু আমার মুখে

কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারি না সে কথা তো তুমি বেশ ভাল করেই জান—

কি ভেবে মা সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর পরিবর্তন করে নিলেন। আরও কাছে সরে এসে আমার একটা হাত ধরলেন। যেন ভারী একটা দুঃখে ভেঙে পড়ে কথা বলতে লাগলেন মা, তোরা কেউ আমাকে বুঝবি না—বুঝবি না। ইচ্ছেমতো কাজ আমি করতে পাই এ বাড়িতে ?

আস্তে হাত সরিয়ে নিয়ে আমি বললাম, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে কে তোমাকে বলেছে মা ?

এখানে থাকলে আস্তে আস্তে মানুষ কেমন করে অন্য রকম হয়ে যায় সে কথা তুই বুঝবি না—কে চায় পার্টিতে কাঠের মতো বসে থাকতে ? আজ সনৎ এসেছিল কিন্তু ওর সঙ্গে আমি কথাই বলতে পারলাম না। আর ওকে পার্টিতে নিয়ে গেলে ও নিজেই অস্বস্তিতে গুম হয়ে থাকত—

তুমি সে কথাটা ওকে বলে দিলেই তো পারতে ?

কখন বলব ?

ও যখন তোমাকে টেলিফোন করেছিল, দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে আমি বললাম, তুমি তখন ওকে বললেই তো পারতে যে আজ অনেক লোক আসবে আমাদের বাড়িতে—

ও কিছু মনে করবে বলে সে কথাটা আমি ওকে বলতে পারি নি শ্রীমতী।

সত্যি কথা সহজ ভাবে বললে কেউ কিছু মনে করবে না মা।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন আমার কাছেও তিনি ধরা পড়ে গেছেন। আর কোন কথা বললেন না তিনি। আস্তে আস্তে সরে গেলেন আমার সামনে থেকে। ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। রাস্তায় একটা লোকও নেই। গাছের পাতারা হাওয়ায় থেকে থেকে সন্ সন্ শব্দ করছে। সেখানে আরও

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার ইচ্ছে থাকলেও আমি দাঁড়াতে পারলাম না। আমার এই দেহ আমি এখন এলিয়ে দিতে চাই বিছানায়।

পা টিপে-টিপে আমি আমার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কেন আজ এমন করে আমার নিজেকে গোপন করবার ছল? এখন কে আছে এখানে? কেউ নেই। বাবুর্চি-বেয়ারাদের ঘরের আলোও নিভে গেছে। মাও ঘুমোতে চলে গেছেন। কেউ দেখছে না আমাকে।

তবু আমার মনে নিজেকে গোপন করবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমার কথা কেউ জানবে না—কেউ বুঝতে পারবে না যে আজ হঠাৎ আমি আর এক জনের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করেছি। নিবিড় আকর্ষণের তীব্র একটা স্বাদ অনুভব করছি আমার বুকের পাঁজরে-পাঁজরে। আমার চোখের পাতায় বুঝি আজ ঘুমের ছায়া পড়বে না।

এখন কি করছে সনৎ? শীত-শীত অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে আমি সবচেয়ে আগে তার কথা ভাবলাম। যদি আরও জোরে বর্ষা নামে এখন আর বিদ্যুৎ-চমকানি থেকে থেকে আলোর ঝিলিক দিয়ে যায় তখন কোথাও না কোথাও কি দাত্বরীর ডাক শোনা যাবে না।

হ্যাঁ, আমি বেরিয়ে পড়তে পারব। সজল রাতের অন্ধকারে টানা পিছল পথ ধরে ঠিক গিয়ে পৌঁছতে পারব এখান থেকে অনেক দূরের একটা মেসে। কোন বাধা আমি মানব না। কেউ আমার পথ রোধ করে দাঁড়াতে এলে আমি তাকে সরিয়ে দেব।

বর্ষার রাত আমার কাছে সঙ্কেতময়ী হয়ে ওঠে!

আট

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি মাকে দেখতে পাই নি। তাঁকে আমার দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু আজ ইচ্ছে করেই আমি তাঁর খোঁজ করেছিলাম। ভেবেছিলাম কথায়-কথায় জেনে নেব মাসে-মাসে পত্রিকা প্রকাশের জন্যে তাঁর কত টাকা খরচ হয়। আর পরবার নাম করে আমার কয়েকটা গয়নাও তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেব।

কাল আমার কথা সনৎ বিশ্বাস করতে পেরেছে কি না জানি না। হয়তো পারে নি। ভেবেছে আমি ঝোঁকের মাথায় তাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি মাত্র। সে-ধারণা দূর করবার জন্যে আমি আজই তার মেসে গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হব। যে-ঘোরই লাগুক আমার চোখে এক মুহূর্তের জন্যে কর্তব্যের কথা আমি যেন কখনও না বিস্মৃত হই।

কিন্তু মা কোথাও নেই। দোতলার বারান্দায় তাঁর লেখবার টেবিলের কাছাকাছিও না। মা বাড়িতে আছেন কি নেই সে কথা যদিও বাবার জানবার কথা নয় তবুও আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, মা এত সকালে কোথায় গেছেন বাবা?

বারান্দায় নেই? খবরের কাগজের ওপর থেকে চোখ তুলে বাবা আমাকে পালটা প্রশ্ন করলেন।

আমি ঘাড় নেড়ে বাবাকে জানালাম, না। মনে মনে ভাবলাম হয়তো বিজ্ঞাপন জোগাড় করবার জন্যে কারুর না কারুর বাড়ি গেছেন। আজকাল প্রায়ই তিনি একা-একা যখন-তখন বিজ্ঞাপনের জন্যে এখানে-ওখানে যান।

একদিন বাবা মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, সব জায়গায় তোমার নিজের যাওয়ার দরকার কি। সনৎকে পাঠালেই তো পার—

থাক থাক—মা ঝাঁজের একটা প্রচণ্ড তোড় ছুঁড়ে মেরেছিলেন বাবার মুখের ওপর, তোমাকে আর পরামর্শ দিতে হবে না। যাকে-তাকে পাঠালেই বিজ্ঞাপন জোগাড় হয়ে যাবে, না? কি বোঝ তুমি মাসিক পত্রিকা চালাবার ব্যাপার?

বাবা পাইপ খোঁজবার নাম করে তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলে গিয়েছিলেন। মা কিন্তু তখনও থামেন নি। বাবাকে শুনিয়ে বেশ জোরে জোরেই বলে চলেছিলেন, তাও যদি একবার দয়া করে তোমার বন্ধু-বান্ধবদের বলে দিতে আমার কাগজে মোটা টাকার বিজ্ঞাপন দিতে! টেলিফোনে মাঝে মাঝে মোটে এক হাজার টাকার বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে আবার লেকচার দিতে এসেছ! কাগজের জন্যে কিছু করতেই আমার বাধবে না এ কথাটা তুমি জেনে রেখো—

পাইপ ধরিয়ে হাসতে হাসতে বাবা আবার এ ঘরে এসে মাকে বলেছিলেন, কাগজের জন্যে আমাকে খুন করতে পারবে?

ইতস্তত করেন নি মা, খুব পারব। আবার ওসব আজে-বাজে পরামর্শ দিতে এসে দেখ না—

ঘন ঘন পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে মুখের চারপাশ অন্ধকার করে তুলেছিলেন বাবা। আর কোন কথা বলেন নি। মাও চুপ করে গিয়েছিলেন। আর সেদিন হঠাৎ আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে শুধু বাবাকে নয়, দরকার হলে ওই পত্রিকার জন্যে মা সবচেয়ে আগে সনৎকে খুন করতে পারেন।

অতদিন আগে মা-র চোখ-মুখ দেখে কথাটা আমার কেন মনে হয়েছিল তার কারণ আমি আজ আপনাদের বলতে পারব না। কারণ বলতে না পারলেও পত্রিকার কোন্ স্বার্থ মার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল সে কথা এই প্রসঙ্গে আর উল্লেখ না করলেও চলে।

পত্রিকার মান নিয়ে মা ভাবনা করেন না। তাঁর ক্ষমতাই বা কতটুকু। কিন্তু অর্থের জন্যে কেন তাঁর এই নির্লজ্জ লোভ! নানা

মনীষীর রচনার চেয়ে বিজ্ঞাপনের ওপর কেন তাঁর এত বেশি ঝোঁক। প্রশংসা কিম্বা অর্থ—কোনটার কোন ভাগই তিনি সনৎকে দেবেন না বলে এখন শুধুই তাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলেন!

কিন্তু সনৎ হয়তো কোনদিনও জানতে পারবে না যে সেইদিন প্রথম সে আমার কাছে একটা জীবন্ত শপথের মতো হয়ে উঠল। মা তাকে খুন করতে পারবেন না। আমি রূঢ় হাতে মুছে দিয়ে যাব মা-র এই হীন লালসা। হ্যাঁ, ওই পত্রিকা তিনি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। সামান্য লাভের দিকে মন রাখতে গিয়ে তাঁকে অনেক বড় জিনিস হারাতে হবে।

আমি তাঁর দম্ভ ভেঙে দিয়ে এ বাড়ি থেকে চলে যাব।

আজ ঝির ঝির বৃষ্টি নেই। তাজা রোদের দীপ্তিতে পথের কাদা শুকিয়ে গেছে। এখন আকাশে মেঘের চিহ্নও নেই। আমাকে এখন যেতে হবে অনেক দূর। রোদ হোক, জল হোক সনতের মেসে আমি যাবই।

মা-র জন্যে অপেক্ষা করে-করে বেলা হয়ে গেল। আর একটু পরেই বাবা অফিসে বেরিয়ে যাবেন। আমি রোজকার মতো তাঁর খাবার ঠিক করে দিলাম। বাবা তাকিয়ে দেখলেন না আমার মুখের দিকে। কিন্তু দেখলেও, খুশির একটা বিদ্যুৎ-আভা যে আমার মুখে ঝলসাচ্ছে তা কি তিনি লক্ষ্য করতেন!

ভেবেছিলাম ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ব। কারণ অতদূর গিয়ে যদি সনতের দেখা না পাই। ইচ্ছে করেই আগে থেকে ওকে যাবার কথা কিছু জানাব না। আমি জানি, জানতে পারলেই ও ছুটে আসবে আমাদের বাড়িতে। ওর মেসে কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না। এ সঙ্কোচ আমাকে পীড়া দেয় বলেই তা ভেঙে দিতে আমি ওখানে যাচ্ছি।

আকাশটা মেঘলা হলে ভাল হত। আমার কপাল ঘেমে

উঠত না। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই বোধহয় আমি বেশি খুশি হতাম। তাহলে রাস্তার লোক এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত না আমার দিকে। বৃষ্টির ছাঁট থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত থাকত।

কিন্তু ভয়টা কিসের আমার! কাকেই বা ভয়? না, ভয় নয়। কিন্তু নিজের মনের কথা লুকিয়ে রাখবার সূক্ষ্ম আনন্দের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করব বলেই নিজেকে আড়াল করবার কথা মনে জাগছে।

কেউ যেন এখন আমাকে লক্ষ্য না করে।

বাসে কিম্বা ট্র্যামে ওঠা সম্ভব নয়—তাহলে আরও দেরি হয়ে যাবে। একটা ট্যাক্সির অপেক্ষায় অসহিষ্ণু হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মাকে নিয়ে আমাদের বড় গাড়িটা ফিরে আসছে। আসুক। গাড়ি নিয়ে সনতের মেসে যাওয়ার আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই।

মা আমাকে দেখতে পান নি। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি তাঁকে দেখে নিয়েছি। হাসি-হাসি মুখ। মাথা নিচু করে কি একটা পড়তে-পড়তে চলেছেন। কোন লেখকের লেখা নয় নিশ্চয়ই। হয়তো নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তা চিঠি লিখেছেন। আর সে-চিঠি পড়তে-পড়তে লাভের অঙ্ক হিসেব করে মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হাত দেখাতেই ট্যাক্সিটা থামল। সাবধানে দরজা খুলে আমি উঠে বসলাম। তৃপ্তির অদ্ভুত ছোঁয়া লাগল যেন আমার শিরায়-শিরায়! খুব আস্তে ড্রাইভারকে বললাম, আমায় কলকাতার অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে। কথা শেষ হতে না হতেই ট্যাক্সি ছুটে চলল।

এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের জন্যে যেন আমি বেরিয়ে পড়েছি। কড়া রোদের আঁচ লাগছে আমার চোখে-মুখে। হাওয়ার ঝাপটায়

চুল উড়ছে। গতির এক দুরন্ত বেগে আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আমাদের বাড়ি পেছনে পড়ে রইল। অস্পষ্ট হয়ে এল মা-র মুখ। বাবাও যেন মিলিয়ে গেলেন। এখন যেন সব ছেড়ে—সকলকে ফেলে আমি একা এগিয়ে চলেছি।

না, এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ইতস্তত করি নি। সঙ্কোচের কোন রেখা পড়ে নি আমার কপালে। আমাকে দেখে সনৎ কি ভাববে না ভাববে তা নিয়ে আমি কোন গবেষণা করিনি মনে মনে। তবে এটা ঠিক যে তাকে আমি আর আমাদের বাড়িতে আসতে দেব না। প্রয়োজন হলে আমিই যাব তার কাছে বার বার।

গলির মুখেই আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। ভাড়া চুকিয়ে এগিয়ে গেলাম সরু রাস্তা ধরে। কাগজ বের করে নম্বর দেখবার দরকার নেই। ওটা আমার খুব মনে আছে। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে আমি চলতে লাগলাম।

রাস্তায় খেলা করতে-করতে ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। ছোট দোকানের রোগা একটা লোক কৌতূহলী চোখ ফেলছে আমার ওপর। আমি ওর কাছেই এগিয়ে গিয়ে সনতের মেসের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

মিষ্টি হেসে লোকটি বলল, সনৎ বাবুকে খুঁজছেন ?

হ্যাঁ—

ওই যে সামনের দোতলা বাড়ি—একতলার বাঁ দিকের ঘর—

এতক্ষণ আমার মনে কোন সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু লোকটির হাসি-হাসি মুখ দেখে যেন লজ্জার আভা ফুটে উঠল আমার গালে। আর কী গরম লাগছে এখন! কড়া রোদ্দুর যেন পুড়িয়ে মারবে আমাকে। সকলের দৃষ্টি এড়াতে আমি সেই বাড়িটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

বাইরেই দাঁড়িয়েছিল সনৎ। যেন খুশির চমকে ছুটে এল আমার কাছে, লিখে রাখবার মতো দিন বটে আজ—হাসতে হাসতে ও বলল, যদি আর একটু আগে আসতে—

আমিও হেসে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কি হত?

তোমার মা-র সঙ্গে দেখা হয়ে যেত—

হঠাৎ স্থির হয়ে গেলাম আমি। হাসির রেখা মিলিয়ে গেল ঠোঁটের ফাঁক থেকে। আমার দেহটা যেন লোহার মতো হয়ে উঠল। থেমে থেমে ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, মা এসেছিলেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে?

অবাক হবারই কথা বটে, না? ওর ঘরের দিকে যেতে যেতে ও আমাকে বলল, আমিও ওঁকে দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সেই গরমে সনতের ঘরে ঢুকেও যেন ঠাণ্ডা একটা ঢেউএর ঝাপটায় আমি কয়েক পা পিছিয়ে এলাম। বহুদিন চুণকাম হয় নি বলে দেয়াল কালো হয়ে গেছে। রোদ্দুর ক্ষীণ রেখাও আসতে পারে না ঘরে। বই আর পুরনো কাগজের স্তূপ এখানে-ওখানে। দেয়ালে দু-একটা পেরেক মেরে আলনার কাজে লাগানো হয়েছে। ঘরের মাঝখানে খুব সাধারণ দুটো তক্তপোষ।

মা কেন এসেছিলেন?

তক্তপোষের ওপর আমাকে বসতে বলে সনৎ বলল, নেমন্তন্ন করতে।

আরও ঠাণ্ডা স্বরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ?

কাল না খেয়ে চলে এসেছিলাম কি না—তাই।

তারপর? তক্তপোষের ওপর খোলা খবরের কাগজটার ওপর চোখ রেখে আমি বললাম, কবে যাবে নেমন্তন্ন খেতে?

আজ রাত্তিরে, একটু দূরে বসে পড়ল সনৎ। মা ওর মেসে এসেছিলেন বলে যেন খুশিতে ভেঙে পড়ছে। এতদিন যত অপমান

তিনি করেছিলেন ওকে—এখানে তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সব কিছু মুছে গেছে তার মন থেকে। সব ভুলে গেছে সনৎ।

এ ঘরে বসে আমার হাঁপ ধরে গেল। রান্নার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসছে। আর মশলার উৎকট একটা গন্ধ। পাখা নেই। দরদর করে ঘাম ঝরছে সনতের শরীর বেয়ে। কিন্তু এখনও ওর মুখে হাসি লেগে আছে। আমি এসেছি বলে নয়, হয়তো মা এসেছিলেন বলে।

কোন শব্দ নেই কোথাও। মেস প্রায় খালি। বোধহয় এর মধ্যেই সকলে কাজে বেরিয়ে গেছে। আমার আর সনতের কোন কাজ নেই বলেই আমরা তুজন বসে আছি চুপচাপ।

কিন্তু সনৎকে দেখার সব উৎসাহ আমার নিভে গেছে। পত্রিকা প্রকাশ করবারও আর কোন আগ্রহ অবশিষ্ট নেই। ও রক্ষা করুক মা-র কৃপার নিমন্ত্রণ। ও আবার ছুটোছুটি করুক মা-র পত্রিকার জন্যেই। আমি যেমন ছিলাম তেমন থাকি। আমি আবার দূরে সরে যাই।

উঠে দাঁড়ালাম, আজ যাই সনৎ—

সে কী, বিচলিত হয়ে সনৎ বলল, না না, এই তো এলে—হঠাৎ ও যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল, এ ঘরে বসে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

একবার ইচ্ছে হল বলি, হ্যাঁ। শুধু কষ্ট নয়, সনতের কথা শোনবার পর এ ঘরে বসে থাকতে আমাব নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ও মূর্খ। তাই বুঝতে পারে না যে আমি ওর ঘর দেখতে আসি নি—ওকে দেখতেই এসেছি। আর ওর কথা শুনেই হতাশ হয়েছি।

মুখ তুলে প্রশ্ন করলাম, এ ঘরে বসে থাকতে মা-র বুঝি কষ্ট হয় নি?

জোরে মাথা ঝাঁকাল সনৎ, একটুও না। উনি অনেকক্ষণ বসে-ছিলেন আর যতক্ষণ বসেছিলেন ততক্ষণ এ ঘরের প্রশংসা করলেন।

কি বললেন? আমার প্রশ্নে বিদ্রূপের সুরটা ধরতে পারার মতো বুদ্ধি বোধহয় সনতের নেই।

বললেন যে, তুমি কী সুখী সনৎ! কী সহজ সরল আর নিরহঙ্কার তোমার জীবনযাত্রা!

তক্তপোষের ওপর আবার বসে পড়ে আমি বললাম, আর?

বললেন যে, আমার যদি স্বামী না থাকত, মেয়ে না থাকত তাহলে আমি ঠিক এমন জীবনই বেছে নিতাম।

তুমি কি বললে?

আমি ওঁর কথা শুনছিলাম, একটা খবরের কাগজ ভাঁজ করে হাওয়া খেতে খেতে সনৎ বলল, কাল আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি বলে খুব দুঃখ করলেন। বললেন, আমি যদি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন থাকি তাহলে নাকি বুঝতে পারব যে লৌকিকতার কী কঠোর নিয়ম মেনে ওঁকে চলতে হয়—

আমি এসব কথা জানি। মা যে কথাগুলো বলে গেছেন সনৎকে, অক্ষরে-অক্ষরে মিলিয়ে ঠিক সেই কথাগুলোই আমি আবার তাঁকে শুনিয়ে দিতে পারি। মা-র মুখ থেকে আমি নিজেই তো এসব কথা কতবার শুনেছি।

কিন্তু আশ্চর্য, সনৎ কোন প্রতিবাদ করেনি মা-র কথার। নিজে যে আঘাত পেয়েছে সে কথাও জানায় নি। তিনি এখানে এসেছিলেন বলে ধন্য হয়ে গেছে। কাল সারা সন্ধ্যে ওর সঙ্গে আমার যত আলোচনা হল তার কোন মূল্যই আর রইল না আজ সকালে। আমি স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখলাম সনৎকে।

তাহলে আজ তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে?

হ্যাঁ, উনি অনেকবার বলে গেছেন—

যেন কোন কোমলতা নেই আমার শরীরে, আমি যদি জানতাম যে তোমার কথার কোন দাম নেই তাহলে আজ এমন করে তোমার এখানে আসতাম না।

ফ্যাকাশে মুখে বিব্রত সনৎ প্রশ্ন করল, কি হল শ্রীমতী ?

কিছু না, কটু উত্তর দিলাম, আমিই ভুল করেছিলাম। যে পত্রিকা প্রকাশের কথা আমি কাল তোমাকে বলেছিলাম তার আর দরকার হবে না—কি বল ?

বাঃ, কেন দরকার হবে না ? আমি ওঁকেও তো আজ সেই কথাই বললাম।

চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কি বলেছ মাকে তুমি আমাদের পত্রিকার কথা ?

না না, আমার চমকের কথা বোধহয় বুঝতে পারল সনৎ, তোমার কথা কিছু নয়—সে যেন ভেবে ভেবে কথা বলতে লাগল, উনি যখন আমাকে ওঁর পত্রিকার জন্যে দু-এক জায়গায় যাবার কথা বললেন তখন আমি বললাম যে অন্য আর একটা কাগজের ভার হয়তো আমাকে নিতে হতে পারে।

মা কি বললেন তোমার কথা শুনে ?

বিশেষ কিছু নয়। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর হালকাভাবেই বললেন, সাহিত্যের মান অনেক নিচে নেমে গেছে সনৎ, যত ভাল ভাল পত্রিকা বার হয় ততই লাভ আর তুমি পেছনে থাকলে কাগজ যে ভাল হবেই সে তো জানা কথা।

আমি হেসে বললাম, বাঃ, তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি হলে তো তাঁর কথা শুনে ?

নিজের প্রশংসা শুনে কে না খুশি হয় ! কৌতুকের দৃষ্টি দিল সনৎ আমার দিকে, তাঁকে একটা কথা বলবার খুব ইচ্ছে করছিল—

কি ?

সে পত্রিকার নাম হবে, শ্রীমতী।

না বলে ভালই করেছ, মুখে কপট গাম্ভীর্য নামিয়ে আমি বললাম, এ পত্রিকা ঠিক কারুর খেয়াল মেটাবার জন্যে কিম্বা একটা মোটা অঙ্ক লাভের আশায় প্রকাশিত হচ্ছে না।

যে-কারণেই প্রকাশিত হোক শ্রীমতী, জোরে-জোরে খবরের কাগজের বাতাস করতে করতে সনৎ বলল, আমার একটা মস্ত লাভ যে হল সে কথা তো তুমি অস্বীকার করতে পার না—আমি বেঁচে গেলাম।

হাসির পুরু একটা রেখা এতক্ষণ পর কেঁপে উঠল আমার মুখে, তোমাকে বাঁচাবার সাধ্য কারুর নেই—তুমি মরবেই।

তুমি নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছ শ্রীমতী।

বলবই।

কেন ?

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বললাম, তুমি আর কোনদিন আমাদের বাড়িতে যাবে না বলেই আজ সকালে আমি এখানে এসেছি সনৎ।

তুমি যদি বারণ কর তাহলে নিশ্চয়ই যাব না।

আমাকে বারণ করতে হবে কেন ? মান-অপমান জ্ঞান তোমার নিজের নেই ? মা তোমাকে বললেন বলেই—

আমি তোমাকে দেখতেই যেতাম শ্রীমতী।

এসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তোমার ব্যক্তিত্বের চেয়ে আমি কেন বড় হয়ে উঠব ? তুমি মাকে টেলিফোনে বলে দাও যে তুমি আজ নেমন্তন্ন খেতে যেতে পারবে না।

কোন প্রতিবাদ না করে সনৎ দৃঢ়স্বরে বলল, বলে দেব। তারপর গলার স্বর নামিয়ে আস্তে বলল, উনি নিজে কষ্ট করে এসেছিলেন বলেই আমি রাজি হলাম।

আর ওঁকে দেখেই কালকের সব কথা বুঝি ভুলে গেলে ?

না ভুলি নি, কিন্তু তোমার মা বলে—

সে কথা আজ থেকে তুমি একেবারে ভুলে যাবে সনৎ। আমি নিজেই যখন আমার মা-বাবার কোন কাজের সমর্থন করতে পারি না, তখন তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সূত্র ধরে আর কখনও

কোন কারণেই তুমি ওঁদের কাছে নিজেকে ছোট করতে পারবে না।

সনৎ বলল, না।

কেন এসেছিলাম সনতের কাছে, কি কথা ছিল আমার ওকে বলবার—কোন দরকার সত্যি ছিল কি-না—মনে নেই। আমি ঘামতে ঘামতে তাকাতে লাগলাম এপাশে আর ওপাশে। একবার দেয়াল দেখলাম—একবার মেঝে। আর দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মা-র কথা মনে পড়ে গেল। একবারও কাল আমাকে বলেন নি যে আজ ভোরেই খুঁজে খুঁজে সনতের বাড়িতে এসে উপস্থিত হবেন।

কিন্তু কেন আজ ভোর না হতেই মা এসেছিলেন সনতের কাছে? এখন ওকে কি প্রয়োজন তাঁর? সনৎ আমার মা-র যে চেহারাই দেখুক এতদিন, আমি অনেকবার তাঁর আসল রূপ দেখেছি। আর দেখেছি বলেই তাঁর আজ হঠাৎ সনতের মেসে আসবার কোন কারণই খুঁজে পেলাম না।

আমার যে মা আজ তাঁকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন, আমি জানি অদূর ভবিষ্যতে যখন তিনি আমার সঙ্গে তার যোগা-যোগের কথা জানতে পারবেন কিম্বা সন্দেহ করবেন তখন অমার্জিত ভাষায় তাকে গেটের বার করে দিতেও দ্বিধা করবেন না।

মা-র সেই রূঢ় স্বর শোনবার সুযোগ আমি সনৎকে দিতে চাই না। তাই এখানে বসেই ওর সঙ্গে স্পষ্ট আলোচনা শুরু করলাম।

মা তোমাকে জিজ্ঞেস করেন নি যে কাল আমার সঙ্গে তোমার কি কথা হল?

হ্যাঁ, করেছিলেন।

তুমি কি বললে?

বললাম, লেখার কথাই হচ্ছিল। আজকালকার উপন্যাস কেমন হচ্ছে না হচ্ছে—এইসব কথা আর কি—

তার চেয়ে বললেই তো পারতে যে তুমি কোন কথাই তাঁকে বলতে পাববে না ?

তোমার মা-র সঙ্গে অভদ্র ব্যবহাব কবব কেমন করে ?

সনতের কথা শুনে শবীবটা জ্বলে উঠতে চাইল। পাঁচ কথা ভেবে কেন ও অপমান গায়ে মাখে। কেন বুঝিয়ে দিতে জানে না যে আমাব মা-বাবাব চেয়ে ওব মূল্যও কম নয় ?

আজ আমি ওব সামনে কতগুলো শর্ত ফেলে যাব। যদি মানে তো ভালোই আব যদি না মানতে পাবে তাহলে আজই ওর সঙ্গে আমাব শেষ দেখা।

কাল তুমি আমাদেব বাড়িতে গিয়েছিলে, গম্ভীব চাপা স্বরে আমি বলতে লাগলাম, মা তোমাব খোঁজ নেন নি—একবারও ডাকেন নি। আজ তিনি যখন তোমাব এখানে এলেন তখন তাঁকে জানানো উচিত ছিল যে তুমি সে অপমান গায়ে মেখেছিলে !

কাল সন্ধ্যাব মূল্য আমাব কাছে অনেক শ্রীমতী। তাই চুপ কবেছিলাম। কিন্তু আমি যে নিজেব মনুষ্যত্ব নিয়ে খেলা কবতে পারি না সে কথা কাল আমার সঙ্গে আলোচনায় তুমি কি বুঝতে পাব নি ?

পেবেছি বলেই তো আমাব অবাক লাগে। এতদিন মূর্খের মতো কেন তুমি শুধু শুধু ঠকে এলে !

ঠকেছি বলেই তো তুমি আজ এতদূব ছুটে এলে।

না ঠকলেও হয়তো আসতাম। কিন্তু ঠকবাব পালা এখানেই শেষ—সনতের আঙুলগুলো দেখতে দেখতে বললাম, আমি আজ তোমাকে কতকগুলো শর্ত দিয়ে যাব।

বল ?

তুমি আর কখনও মা-বাবার কোন কথায ভুলবে না।

সনৎ হেসে বলল, না।

ওঁরা হাজারবাব ডাকলেও ও বাড়িতে আর কখনও যাবে না।

কয়েক মিনিট দেরি লাগল সনতের উত্তর দিতে। কি ভাবছে ও মুখ নামিয়ে? আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা? ও কেন বোঝে না যে এখন সেটা আর ওর একার ভাবনা নয়? আমারও ভাবনা।

আমি ও বাড়ি থেকে একদিন বেরিয়ে আসব বলেই তো সেখানকার দরজা ওর জন্যে এখন থেকেই বন্ধ করে দিচ্ছি।

হঠাৎ মাথা তুলে সনৎ বলল, তোমার শর্ত আমি মেনে নিলাম শ্রীমতী। কথা দিলাম যে ও বাড়িতে আর কখনও যাব না।

নিশ্চিন্ত হয়ে এবার আমি বললাম, পত্রিকার কাজ যত তাড়াতাড়ি হয় আরম্ভ করে দাও। কি লাগবে না লাগবে আমাকে কাল-পরশুর মধ্যে জানিও। আমি সব ঠিক করে দেব।

কি একটা ভাবছিল সনৎ। কোন কথা আমাকে বলল না অনেকক্ষণ। বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আমিও কোন প্রশ্ন করলাম না ওকে। ভাবুক যা খুশি। আমার কাজ শেষ। এবার আমাকে ফিরে যেতে হবে।

আমি বলছিলাম, তক্তপোষের ওপর খবরের কাগজটা রেখে সনৎ বলল, এখন থাক। পত্রিকা আমরা অনেক পরে বের করব।

তার কথা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল হবে। মিসেস মুখার্জি মনে করবেন তাঁকে ছোট করবার জন্যে ইচ্ছে করেই আমি—

হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই। তিনি যা খুশি মনে করুন। তাঁর সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল করতেই আমি চাই আর—একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সব সঙ্কোচ কাটিয়ে নিয়ে বললাম, পত্রিকা প্রকাশ না করলেও তোমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে—ভুল সংশোধন করে বললাম, তাঁদের সঙ্গে আমার ভয়ঙ্কর গোলমাল হবেই।

জানি। কিন্তু আমাকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে তুমি কেন শুধু শুধু গোলমাল করবে শ্রীমতী?

মৃদুস্বরে বললাম, জানি না।

কিন্তু আর এখানে বসে থাকা ঠিক নয়। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সনৎও। কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ও এল আমার সঙ্গে সঙ্গে। ফাঁকা ট্র্যাম। আমি ট্র্যামেই যাব। ট্যাক্সি নেবার দরকার নেই।

কবে দেখা হবে আবার? সনৎ জিজ্ঞেস করল।

আমি চিঠি লিখব।

ট্র্যাম এসে গেল।

নয়

মা যা-ই বলুন না কেন, যদি তাঁর কোন কথা আমার ভাল না লাগে তাহলেও আমি প্রতিবাদ করব না। আমি যে-পথের সন্ধান পেয়েছি সে-পথ ধরেই আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব।

কথায় শুধু কথা বাড়ে। তর্কের ঝড়ে মনের ফাঁকে-ফাঁকে ধুলো জমে। আর তখন আক্রোশের আঁচে ঠিক পথ চিনতে পারি না। তার চেয়ে চুপচাপ কাজ করে যাওয়া অনেক ভাল।

তবু প্রায়ই আমি যেন অনেক নিচে নেমে আসি। মাঝে মাঝে যখন আকাশের দিকে তাকাই আর লক্ষ্য করি একটা চিল ছোট হতে-হতে হঠাৎ গভীর নীলে হারিয়ে যায় আর হাওয়ায় গাছের পাতা কেঁপে ওঠে তখন মনে মনে আমিও যেন অনেক ওপরে উঠে যাই। ঝগড়া-তর্ক, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, দেনা-পাওনা—এসব কোন কথাই আমার মনে থাকে না।

হয়তো কারুরই এসব কথা মনে থাকত না যদি পরিবেশ অনুকূল হত—যদি একজন অন্যায় আক্রমণ না করত আর একজনকে—যদি অন্যকে ঠকিয়ে নিজে না নিত লাভের বড় ভাগ।

আমি যদি এ বাড়িতে না জন্মাতাম তাহলে হয়তো ছোট ব্যাপার নিয়ে আমার কথা বলবার কোন দরকারই হত না। আমি আমার ব্যাপক একটা রূপ দেখে হয়তো নিজেই পূর্ণ হয়ে উঠতে পারতাম।

সেদিন রাতে খাবার টেবিলে মা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। আর খাওয়া থামিয়ে বাবা তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। এবার মা একটা লম্বা মজার গল্প বলবেন আর বাবাকে মন দিয়ে তা শুনতে হবেই।

এমন প্রায়ই হয়। মা-র গল্প মন দিয়ে শোনবার আমার কোন ইচ্ছে নেই। আমি আস্তে আস্তে চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগলাম।

কিন্তু হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে আমাকেও মা-র কথা শুনতে হল।

উঃ, কী কষ্ট করে যে একটা মানুষ বাঁচতে পারে—মা-র স্বরে সমবেদনার লেশমাত্র নেই! প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের একটা সুর কাঁপছে শুধু। কিন্তু কেন ভাবলাম যে এ বিদ্রূপ আমাকে লক্ষ্য করেই।

বাবা কিছু না বুঝে শুধু হাসলেন, তা বটে।

ওই গরিব ছেলেটা, কি যেন নাম—সনৎ, বাবার সামনে থেকে স্যুপের খালি প্লেটটা সরিয়ে নিলেন মা, ও যে অত গরিব আমি তা জানতাম না। একটা জঘন্য মেসে চাকর-বাকরের মতো দুজন একঘরে থাকে।

তাই নাকি? যেন খুব অবাক হয়ে গেলেন বাবা।

কিছুই তো করলে না ওর জন্যে, চিকেন-রোস্টে ছুরি চালাতে-চালাতে কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে মা বললেন, এবার একটা চাকরি-বাকরি করে দাও বেচারিকে, রোস্টের একটা বড় টুকরো মা মুখে তুললেন, শেষে কি না খেতে পেয়ে মরবে?

বাবা যেন মা-র অনুমতি চাইলেন, দেব?

হ্যাঁ, দেবে বইকি কাজ। না না, ওকে আর আমার কোন দরকার নেই, কাঁটায় একটা গোটা সেদ্ধ আলু বিঁধতে বিঁধতে মা বললেন, কী-ই বা করত আমার জন্যে ও! কয়েকটা বোকা-বোকা লেখকের আজে-বাজে লেখা ছাপিয়ে শুধু এক গাদা টাকা নষ্ট করিয়েছে—

হুঁ হুঁ, হুইস্কির গ্লাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বাবা সায় দিলেন।

আর একবার ওঁকে মনে করিয়ে দিলেন মা, চাকরি একটা যত তাড়াতাড়ি হয় করে দিও কিন্তু—

দেব, মুখ তুলে বাবা বললেন, কিন্তু ও কোথায়? আজকাল তো ওর চেহারাই দেখতে পাই না।

কি জানি, মাস্টারি-টাস্টারি জোগাড় করেছে কি না, আজকাল খুব বেশি আসে না—খেতে বললেও না।

পুওর বয়। যাক, ওকে একটা খবর দিয়ে দিও যেন দু-একদিনের মধ্যে আমার অফিসে দেখা করে।

দেব। বেচারিকে অনেক আগেই চাকরি দেয়া উচিত ছিল তোমার। উঃ, অমন করে থাকতে হলে আমি বোধহয় মরে যেতাম।

কিছু বলতে চাই নি। ভেবেছিলাম নিঃশব্দে খাওয়া সেরে উঠে যাব। একটা গাছ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দেখছিলাম। এক ফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলাম। কিন্তু মা-র কথা শুনে হঠাৎ সেই গাছ আর আকাশ আমার চোখের সামনে দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল। আর তারই ঝাঁজ এসে লাগল আমার বুকে—মাথায়। আমি কেন চুপ করে সহ্য করব? আমি কেমন করে নিজেকে জয় করব! আর সব চেয়ে বড় কথা—কেনই বা করব!

আস্তে প্লেটটা একটু ঠেলে দিয়ে আমি বলে উঠলাম, সাহিত্যের জন্যেও তুমি সনতের মেসে চিরকালের জন্যে থাকতে পারতে না মা!

মা যেন চমকে উঠলেন। তাঁর আঙুলের ফাঁকে কাঁটা চামচের টুনটুন শব্দ থেমে গেল। কঠিন চোখে তিনি তাকালেন আমার দিকে। এ আক্রমণের উত্তরে কি বলবেন হঠাৎ ঠিক করতে পারলেন না। আর পারলেন না বলেই বোধহয় জ্বলে উঠলেন মনে মনে।

হ্যাঁ, পারতাম! একটু বেশি জোরেই কথা বললেন মা, কিন্তু সে কৈফিয়তে তোর কি দরকার শুনি? আমার কোন খবর রাখিস তুই?

মা চিৎকার করলেও আমি ঠাণ্ডা স্বরেই কথা বলতে লাগলাম, তোমার সব খবরই আমি রাখি, এক মুহূর্ত থেমে বললাম, আর আজকাল বোধহয় একটু বেশিই রাখি।

বাধা দিয়ে মা বললেন, তা ছাড়া আর কাজ কি তোর ?

ভাবলাম থেমে যাই। তর্কের ঝড়ে ওড়া একরাশ ধুলো গায়ে মেখে ছটফট করব না। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলাম না। অন্যায় মেনে নিয়ে যারা মনে-মনে সান্ত্বনা পায়—শান্তি রক্ষা করে—তারা ভীরু—তারা স্বার্থপর। আমিও কি তাই ?

আমাকে তো তোমরা কোন কাজ করতে দাও নি। যখনই যা করতে গেছি, কেবলই বাধা দিয়েছ। এমন কি, তোমার পত্রিকার দপ্তরেও আমার জন্যে কোন কাজ নেই।

না নেই। অন্ধ ক্রোধে যেন মা-র মুখে শরীরের সব রক্ত এসে জমা হল, কোন কাজ হয় তোমাকে দিয়ে ?

ঠিক তখন বুদ্ধ মন্দিরে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজতে শুরু হল। আর মধুর একটা ঘ্রাণ, ঘুম-পাড়ানি একটা আমেজ যেন ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে হাওয়ার কম্পনে ভেসে এল। আমি গন্ধ পেলাম। আমি আমেজ অনুভব করলাম।

হ্যাঁ, এখুনি আমি ওই মন্দিরে শান্তির জন্যে ছুটে যেতে পারি। অস্বস্তির কোন তীর আমার বুকে আর বিঁধবে না। মা-র আক্রমণের চোখা-চোখা কথা আমার কানে পৌঁছবে না। আমি স্বার্থপরতার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যাব।

কিন্তু কেন আমি পালাব ? সব তুচ্ছ করে—সকলকে অস্বীকার করে আমার একার মুক্তি আসবে সে কথা ঠিক—কিন্তু তাহলে কি এমন আক্রমণ বন্ধ হবে ? তীক্ষ্ণ বর্ষার আঘাত এড়াতে যদি আমাকে পালিয়ে গিয়ে শান্তি খুঁজতে হয় তাহলে সে-মন্দির সরে যাক অনেক—অনেক দূরে। আর তার দরজা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাক।

আমি থেমে থেমে মা-র কথার উত্তর দিলাম, তোমার মতে আমাকে দিয়ে কোন কাজ হয়তো হয় না, কিন্তু এটাও ঠিক যে যা কাজ নয় কিম্বা অকাজ আমি তাও করি না।

তার মানে ?

মানে, একটু আগে তুমি যার নাম ভুলে গিয়েছিলে—এই ভোলার কাজ হয়তো আমি করতাম না।

মা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, কী এমন মহামান্য লোক যে সব সময় ওর নাম আমায় মনে রাখতে হবে ?

আমি হাসলাম, মহামান্য না হলে তুমি যে যার-তার নাম মনে রাখ না সে কথা আমি জানি। কিন্তু সনৎ যাই হোক না কেন, ছুদিন আগে তাকে না হলে তোমার চলত না।

তুই সব জানিস দেখছি, খাওয়া ভুলে গেলেন মা, ওকে না হলে আমার চলত না! কেন? কি করেছে ও আমার জন্যে ?

তুমি ভুলে যাচ্ছ মা, পত্রিকা প্রকাশের কথাটা ওই তোমার মাথায় ঢুকিয়েছে।

ঢুকিয়েছে তো হয়েছে কি ? মা-র হাত লেগে প্লেট আর গেলাস যেন চমকে-চমকে উঠল, মাথায় যে কেউ একটা কিছু ঢোকাতে পারে —কিন্তু মাসে মাসে একটা কাগজ বের করতে কত খরচ হয় তা জানিস ? ওর আছে অত টাকা ?

না, নেই, আমি ঠাণ্ডা স্বরেই বললাম, টাকা থাকলে তুমি ওকে অমন করে খাটিয়ে শূন্য হাতে বিদায় করে দিতে পারতে না।

এসব কথা তোর কাছে ও বলে বুঝি ? কর্কশ স্বরে মা বললেন, তা ছু-চার টাকা চায় সে কথা আমাকে বলে না কেন ?

আমি অবাক হয়ে মা-র দিকে তাকিয়ে রইলাম। খাবার প্রবৃত্তি আমার আর নেই। সব যেন তেতো-তেতো হয়ে গেল। বাবা আমাকে দেখছেন। একটা করুণ মিনতি তার চোখে ফুটে উঠেছে— আমি যেন আর কোন কথা না বলি। কিন্তু বলবার এমন সুযোগ পেয়ে আমি চুপ করে থাকব কেন—চুপ করে থাকব কেমন করে!

ছু-চার টাকা! মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে আমি টেনে-টেনে বললাম, মাসে মাসে তোমার কত লাভ হয় মা ?

সে-খবরে তোর দরকার কি? সৌজন্যের মুখোশটা যেন এক মুহূর্তে খুলে পড়ল মার মুখ থেকে, আমার লাভ হোক, লোকসান হোক তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার কারুর নেই।

হ্যাঁ, আছে। একটা মানুষকে দিন রাত খাটিয়ে দু-চার টাকা দিয়ে তুমি বিদায় করে দেবে আর সে মুখ বুজে চলে যাবে—এমন বোকা আজকাল আর কেউ নেই মা।

তাহলে কি করতে হবে আমাকে?

যা করছ তাই, আমি হেসে বললাম, তবে শুধু মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে সনৎকে দিয়ে তুমি আর কোন কাজ করিয়ে নিতে পারবে না। সে আর আসবে না।

না আসুক। সাধাসাধি করবার জন্যে আমিই বুঝি যাব ওর কাছে—

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, তাও তুমি গিয়েছিলে, একটু থেমে হাসি মুখেই বললাম, কিন্তু দেখলে তো, কোন ফল হল না। সনৎ ধন্য হয়ে দৌড়ে এল না তোমার নেমন্তন্ন খেতে—

মা-র চেহারাটা আমার কথার ঝাপটায় হঠাৎ যেন অন্য রকম হয়ে গেল। আমি জানি তাঁর বলবার আর কোন কথা নেই। হয়তো এখুনি সনতের মেসে যাওয়ার কথাটা মিথ্যার কোন কৌশলে অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু তিনি চুপ করে থাকলেও আমি কথা বলবার জন্যে ছটফট করতে লাগলাম। কোন এক তীব্র দাহে সব ভুলে গেলাম। আমি কথা বলে যাব সনতের পক্ষ টেনে। আমি বুঝিয়ে দেব যে মা-র লাভ-যশের মূলে সনতের কাজ কতখানি।

অপদার্থ! মা এবার সনতের সম্পর্কে একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন, আর একবার আসুক এ বাড়িতে—

ওর যাবার অনেক জায়গা আছে। বাবা প্রথমে খাতির করে ডেকে এনেছিলেন তাই এসেছিল। আজ তোমার কাজ হয়ে গেছে বলে তুমি ওকে এড়িয়ে যেতে চাও। কিন্তু—

কি ?

আমি বললাম, ও সব বুঝেই সরে গেছে। কিন্তু এ অপমান কখনই চুপ করে সহ্য করবে না।

এবার যেন খুব জোরে মা কৃত্রিম হাসি হাসলেন, কি করবে ? আমার বিরুদ্ধে কেস্ করে পত্রিকা বন্ধ করে দেবে ?

আমি এক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, কেস্ করবার মতো টাকা ওর নেই। থাকলে কি করত জানি না।

তবে ?

ও আর একটা পত্রিকা বের করবে।

আবার হাসলেন মা। আর একটু হলে তাঁর হাতের ঠেলায় জলের গেলাস পড়ে যেত। বাবার খাওয়া হয়ে গেছে। ছোট হয়ে গেছে চোখ। দৃষ্টিতে ঈষৎ বিরক্তি। এসব কথা শুনতে তাঁর ভাল লাগছে না। বাবা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন।

আমিও তাই চাইছিলাম। যদিও কোন জড়তা ছিল না আমার কথায় কিম্বা যুক্তিতে তবুও আমি সতর্ক ছিলাম। বাবার সামনে খোলাখুলি সব আলোচনা করতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

মাকে আক্রমণ করতে আমার কোন দ্বিধা নেই কিন্তু আমি জানি বাবা মা-র বিরুদ্ধে আমার কোন উক্তিই পছন্দ করবেন্ না ! আর হয়তো তাই আমার কথার প্রতিবাদ করবার জন্যেই তিনি এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন।

হাসতে-হাসতেই মা বললেন, সে-বেলা টাকা আসবে কোথা থেকে ? একটা কাগজ বের করতে কত টাকা লাগে সে-সম্বন্ধে ওই পুচকে ছোকরার কোন ধারণা আছে ?

টাকা আমি দেব, দৃঢ়স্বরে বললাম।

মা-র হাসি থেমে গেল। করুণ একটা ছায়া ফুটে উঠল মুখে। কিন্তু কৌশলে সে-ভাব গোপন করে ক্ষীণ স্বরে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথায় টাকা পাবি ?

তুমি যেখান থেকে পেয়েছিলে সেখান থেকেই পাব, মাকে একবার ভাল করে দেখে নিলাম, আর আমিও সনতের সঙ্গে কাজ করব এ পত্রিকার জন্যে।

কি বুঝিস তুই সাহিত্যের ?

আমার কথা থাক মা।

মা যেন আপন মনেই কথা বলে চলেছেন, কি লাভ হবে তোর একটা বাজে লোকের সঙ্গে বাজে কাগজ বের করে আমি জানি না। আর অমন একটা লোক দিন রাত এ বাড়িতে আসা যাওয়া করে সেটা যে আমরা চাই না সে কথা তুই খুব ভাল করেই জানিস।

একটা ভয়ঙ্কর দাহে যেন আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। সংযমের কথা একেবারেই ভুলে আমি বললাম, তোমাদের মতের সঙ্গে আমার মত কোনদিনও মেলে না। মিলবেও না। আর এ বাড়িতে বাজে লোকের আনাগোনা তুমিই শুরু করিয়েছ! কিন্তু ভয় নেই মা, আগেই তো বলেছি যে সনৎ এখানে আর কখনও আসবে না।

বাঁকা স্বরে মা জিজ্ঞেস করলেন, কথায়-কথায় ফোন করবে বুঝি ?

আমার নির্লজ্জ মা-র ঈর্ষাকাতর মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমি তাকালাম, তারও বোধহয় দরকার হবে না। একটা অফিস হবে কোথাও না কোথাও, আমিই সেখানে যাব।

এসব পরামর্শ সনৎ দিয়েছে, না ?

না। আমিই ওকে বলেছি !

খুকি ! ধমকের স্বরে আমাকে চমকে দিয়ে মা বললেন, ইচ্ছে করে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরো না।

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা—ইচ্ছে হল মাকে বলি যে কথাটা বড় পুরনো। এ প্রয়োগ তিনি যেন না করলেই ভাল করতেন। কিন্তু কিছু বললাম না।

আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলে তিনি আমাকে 'তুমি' বলে কথা বলেন। আমার কেবলই হাসি পায় কেন!

মা-র ভাষাতেই বললাম, কুড়ুল কেন মারব?

অমন একটা ছেলের সঙ্গে তুমি কোন বুদ্ধিতে কাগজ বের করবে! সব কিছুর একটা সীমা থাকা চাই—

তোমাদের দেখে প্রায়ই আমি সে কথাটা ভুলে যাই মা। তুমি অমন একটা বাজে লোকের সঙ্গে কাগজ বের করনি?

কথায় কথায় নিজের সঙ্গে আমার তুলনা করবি না।

তুমি আমাকে ধমক দিয়ে কোনদিনও থামিয়ে দিতে পার নি মা—আজও পারবে না। কাজেই ধমক না দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দাও যে কেন তুমি যা করতে পার তা করবার অধিকার আমার নেই?

বোধ হয় রাগ প্রকাশ করবার বেশি সুবিধা হবে বলে চেয়ার ঠেলে মা উঠে দাঁড়ালেন, আমি যা করি, তোমার তা করা সাজে না। কেন, নিজের বুদ্ধি খরচ করে সে কথাটা বুঝতে পার না?

সকলের বুদ্ধি সমান নয়।

ন্যাকা! বিয়ের আগে এমন কাণ্ড করে বেড়ালে ভবিষ্যতে কি তোমার গতি হবে বুঝতে পার না?

কাণ্ড?

তা ছাড়া আর কি!

আমি এবার কাজ করতে চাই মা, ইচ্ছে করেই আমি টিপে হাসলাম, কাণ্ড একটা কিছুদিন আগে হতে পারত বটে, একটু থেমে বললাম, যখন তুমি জোর করে বিজয়কেতনের সঙ্গে আমার অবাধ

মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছিলে! আশ্চর্য, তখন তো আমার ভবিষ্যতের কথাটা তোমার মাথায় আসে নি?

না। কারণ ওর সঙ্গে আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে চেয়েছিলাম।

যা বলতে চাইলাম তা বলতে পারলাম না। কেন! কেন আমার এই আকস্মিক সঙ্কোচ? যদি বলতে পারতাম, এবার আমি নিজেই সে-ব্যবস্থা পাকা করতে চলেছি—তাহলে?

কিন্তু আর একটাও কথা নেই আমার মুখে। মা-র দিকে দৃষ্টিও নেই। সব আগুন নিভে গেছে। বুদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ এখন মনে হচ্ছে অপূর্ব এক সঙ্গীতের মতো।

ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে সে-মন্দিরে ছুটে চলে যাই!

দশ

আমি অনেকক্ষণ আকাশ দেখি। আমি চোখ বুজে অনেকক্ষণ হাওয়ার শব্দ শুনি। আর এই পুরনো পৃথিবীর নতুন ঘ্রাণ থেকে থেকে আমার নাকে এসে লাগে।

আমার দৃষ্টি শ্রবণ আর ঘ্রাণ—আমার সব ইন্দ্রিয় অলৌকিক এক অনুপ্রেরণায় সজাগ হয়ে উঠেছে।

নিটোল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কান্নার যে প্রবল তরঙ্গ লুকিয়ে আছে, আমি শুধু সে-ক্রন্দনধ্বনি শুনি না, আমি আকাশের গায়ে দেখি জ্যোতির দীর্ঘ এক রেখা। সৃষ্টির প্রথম থেকেই সে-রেখা হয়তো ছিল কিন্তু তা দেখবার দৃষ্টি আমার ছিল না এতদিন। ফুলের মতো হঠাৎ ফুটে উঠেছে আমার তৃতীয় নয়ন। তাই রূপ আমাকে দিল অরূপের সন্ধান।

লেকের জলে আলোর রেখা কাঁপছে। আজ কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি নেই। ঘাসগুলো খটখটে হয়ে উঠেছে। এদিকে মানুষের ভিড় নেই। মাঝে মাঝে একটু দূরের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে আর ভেসে আসছে হর্নের শব্দ।

মাথার ওপর একটা গাছ। পাখিরা কলরব করছে। এ বেঞ্চে আর কেউ নেই। শুধু সনৎ আর আমি। কি একটা যেন ও বলতে চায় আমাকে। দ্বিধা থরোথরো গলার স্বর। বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না।

তবু ওর না-বলা কথা আমি আপনিই বুঝে নিই।

আমাদের পত্রিকা প্রকাশিত হবেই। আয়োজন শুরু হয়েছে। আমি এখানে-ওখানে যাই সনতের সঙ্গে। আর সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারে যেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকে সেদিন এখানে আসি।

আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসে সনৎ। ভেতরে যায় না।

আমিই বাইরে আসি। আমাদের বাড়ির আর কারুর সঙ্গে ওর কোন প্রয়োজন নেই।

আমি বলছিলাম, আমার কাছে সরে এসে খুব আস্তে কথা বলল সনৎ, চাকরিটা নিয়ে নি।

তাহলে অন্য কোন কথা আমাকে বলতে চায় নি সে। এক মুহূর্তের জন্যে আমি যেন নিভে গেলাম, কোন্ চাকরি?

তোমার বাবার অফিসে—

আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলাম ঠিক যেমন করে নিভে গিয়েছিলাম তেমন করেই। সনতের দিকে মুখ ফেরালাম, এতদিন পর হঠাৎ বাবার অফিসের চাকরির কথা কেন তোমার মনে এল সনৎ?

ও মুখ নামাল। ঘাসেব দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। সিরসির হাওয়ায় কম্পনের অনেক রেখা ফুটল লেকের জলে। কোন ছোট ছেলে ঢিল ফেলল কিনা কে জানে। টুপ করে একটা শব্দ হল। সনতের উত্তব শোনবার জন্যে আমি ধৈর্য হারালাম।

এখন একটা চাকরির খুব দরকার শ্রীমতী।

কি দরকার?

তুমি কিছু বোঝনা কেন? আমার একটা হাত কোলের ওপর তুলে নিয়ে সনৎ বলল, আমার মেসের অবস্থা নিজেই তো দেখে এসেছ।

দেখেছি, হাত তুলে নিলাম সনতেব কোল থেকে, পত্রিকার কথাটা তুমি এব মধ্যেই ভুলে গেলে?

ভেবেছিলাম ও গলার স্বর তুলে প্রতিবাদ করবে, না ভুলি নি।

কিন্তু না। সে কথা বলল না ও।

শান্ত স্বরে যেন মিনতি করল আমাকে, সব চেয়ে আগে বাঁচবার প্রয়োজন। কিন্তু অগোছাল সংসারে তোমাকে নিয়ে করুণ বিশৃঙ্খল দিনগুলোকে আমি কেমন করে আমন্ত্রণ জানাব শ্রীমতী?

তুমি ভুলে যাচ্ছ সনৎ, আমার ভাষায় কোন উষ্মা নেই, আমি এক সুশৃঙ্খল সংসারের সব কিছু তুচ্ছ করে বিশৃঙ্খলতার আমন্ত্রণেই বেরিয়ে আসছি ?

জানি। কিন্তু আমি যেমন করে বেঁচে থাকি, তোমাকে তেমন করে থাকতে দেব না।

বাধা দিয়ে দাহের প্রবল যন্ত্রণায় বলে উঠলাম, তাই আমার বাবার দেয়া চাকরি নিয়ে আমাকে সুখে রাখতে চাও ?

কোন উত্তর নেই। জানতাম, থাকবে না। তাই আর অপেক্ষা না করে বললাম, কলকাতা শহরের আরও অনেক অফিসে চাকরি পাওয়া যায়—তুমি না পেলেও আমি পেতে পারি। কিন্তু আমার মা-বাবার কাছ থেকে কৃপা ভিক্ষে করে এখনও কেন তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও ?

তোমার মা আমাকে—নিজেকে সামলে নিল সনৎ। কথাটা ভুল করে আমাকে হঠাৎ বলে ফেলেছে।

মা তোমার কাছে আবার গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

এতক্ষণ আমাকে বল নি কেন ?

তুমি কিছু মনে করো না। আমি কোন কথাই তোমার কাছে গোপন করি না শ্রীমতী। কিন্তু উনি বিশেষ ভাবে বারণ করেছেন যেন তোমাকে—

বুঝেছি, সনৎকে অবাক করে দেবার জন্যেই আমি বলে গেলাম, উনি বাবার অফিসে চাকরি নেবার জন্যে খুব জোর করলেন, না ?

হ্যাঁ।

আর তাঁর পত্রিকার জন্যে পরিশ্রম করেছ বলে এতদিন পর কত পারিশ্রমিক দিতে চাইলেন তোমাকে ?

আমি যা চাইব তাই।

তুমি কত চাইলে ?

ওঁর কাছ থেকে আমি কেমন করে হাত পেতে টাকা নেব শ্রীমতী ?

সেই এক উত্তর সনতের ! আমার জন্যে অপমানের কোন তীর ওর গায়ে বিঁধবে না। বিতাড়িত হলেও ও বারবার ফিরে যাবে সেখানে। কিন্তু ও কি বুঝবে না যে ওর এই কাঙাল বৃত্তি আমার অসহ্য ? ওর এই আপোসের ইচ্ছের মধ্যে আমি কোন পৌরুষ আবিষ্কার করতে পারি না।

হ্যাঁ, আজ'আমি ওকে আঘাত করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেব যে মা-বাবার জন্যে ওর মন যতই সংবেদনশীল হয়ে উঠবে ততই ও করুণার পাত্র হয়ে উঠবে ওঁদের কাছে। জীবনে যাই করুক না কেন সনৎ—যত বড়ই হয়ে উঠুক নিজের গৌরবে—আমার মা-বাবার কাছে ওর কোন দাম নেই।

তুমি জান সনৎ, আমার সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে গেছে। কোন জড়তা নেই আমার স্বরে, যেদিন তোমার-আমার সম্পর্কের কথা মা-বাবা শুনবেন সেদিন দরকার হলে তারা তোমাকে—

আমি কথা শেষ করবার আগেই সনৎ বলল, আমি জানি।

না, তুমি কিছু জান না—তাঁদের সে-মূর্তি তুমি কল্পনা করতে পার না। আজ আমার মা দশবার ছুটে-ছুটে যাবেন তোমার কাছে। চাকরি দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখবেন—পাছে তুমি মনে কর যে উনি পত্রিকার আয় থেকে তোমায় ঠকিয়েছেন।

বিস্মিত সনৎ বলল, উনি তোমায় কিছু বলেছেন ?

না। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি। আর পারি বলেই তোমাকে সতর্ক করে দিতে চাই। কিন্তু আশ্চর্য, তুমি কিছু বোঝ না।

মৃদু স্বরে সনৎ বলল, বুঝি শ্রীমতী। তবু ভুলতে পারি না যে ওঁরা তোমার মা-বাবা। ওঁদের অশ্রদ্ধা করব কেমন করে ?

কিন্তু সনৎ, আমার জীবনে ভোঁতা আবেগের কোন প্রশ্রয় নেই। তোমার কাঙাল মনের এ ছবি তুমি আর আমাকে দেখিও না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আমি বললাম, আমার মা-বাবা! ওঁরা যদি অতি সাধারণ দীন মানুষ হতেন তাহলে আমি জানি, আমার জন্যেও তুমি কখনই তাঁদের কৃপা গ্রহণ করতে না কিম্বা কোন অপমান সহ্য করতে না।

কথা নেই সনতের মুখে। স্থির হয়ে বসে আছে। নড়ছে না! আমি ওর মনের কথা টেনে বের করেছি বলে লজ্জায় হিম হয়ে গেছে কিনা বুঝতে পারছি না। যায় যাক। ওকে আঘাত করে জাগিয়ে তুলব বলেই তো এত কথা বললাম। আরও বলব।

তুমি একা নয় সনৎ, ওর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলাম, তোমার মতো আরও অনেক মানুষ আছে, তারা তাদেরই শ্রদ্ধা করে যারা তাদের ঠকায়, অপমান করে আর তাদের বঞ্চিত করে চরম বিলাসিতায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখে।

আমি সব জানি শ্রীমতী। তোমার প্রত্যেকটি কথা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কথা দিচ্ছি, আমি আর ঠকব না।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কারুর কাছেই না ?

না।

আমার কাছেও না ?

দু-এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সনৎ। আবার আমার কাছে সরে এল। ওর আঙুল স্পর্শ করল আমার হাত। উত্তাপের ছোঁয়ায় তীব্র অনুভূতিতে দেহ কেঁপে উঠল একবার।

উত্তর দাও ?

তোমার কাছে ঠকলেও আমার কোন দুঃখ থাকবে না শ্রীমতী।

কেন?

কথা দিয়ে সব কিছু বোঝানো যায় না।

হয়তো যায় না, হালকা অন্ধকারে স্থির জলের দিকে তাকিয়ে বললাম, কিন্তু আমার কাছে তুমি ঠকবেই বা কেন?

আমার হাতে মৃদু একটা চাপ দিল সনৎ, ইচ্ছে করে তুমিই বা আমার কাছে ঠকছ কেন শ্রীমতী? আমার অর্থ নেই, ঘর নেই—কিছু নেই। তবু কেন তুমি আমাকে এমন করে কাছে টানছ?

সনতের কথা শুনে আমার মন থেকে যন্ত্রণার শেষ রেখাটাও যেন মুছে গেল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কার জন্যে—কিসের জন্যে প্রগাঢ় অনুকম্পার উত্তাল আলোড়ন শুরু হল বুকের মধ্যে। কোথায় বসে আছি ভুলে গেলাম। যুক্তি-তর্কের জগৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেল। মা-বাবার ওপর কোন আক্রোশ—কোন অভিমান রইল না।

একটি-একটি করে তারা ফুটে উঠছে আকাশে। কোথা থেকে বেল ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। নীরব হয়ে গেছে চারপাশ। যে-আবেগের জন্যে কয়েক মুহূর্ত আগে সনতকে ধিক্কার দিয়েছিলাম সে-আবেগেব জোয়ারেই আমি ভেসে চলেছি থরোথরো উত্তেজনায়।

আমার মন উন্মুখ। আমার দেহ অবশ। দূরের ভূমিখণ্ড মনে হচ্ছে রূপকথার দ্বীপের মতো। এ কোন দেশ? এ কোন মানুষ? মৃত্যুর আগে-আগে হয়তো এমন মনে হয় মানুষের কিম্বা নতুন জন্মের আগে-আগে।

আমি জানি না। তবু পায়ের তলায় মাটি আছে আর মাথার ওপর আকাশ। একটা শক্ত হাত। উষ্ণ নিশ্বাস। সজাগ ইন্দ্রিয়। মৃত্যু নয়। নতুন জন্ম!

সমুদ্রের প্রচণ্ড ক্ষুধায় লক্ষ অজগরের মতো ঝলসে উঠছে আমার মন। আলোকস্তম্ভের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে। ধূসর মরুতে কী প্রচণ্ড উত্তাপ! বেলাভূমির বালুকণায় কী আবেগ—কী দাহ!

মৃত্যু হোক! আমার হিংসা দ্বেষ আক্রোশ হারিয়ে যাক সমুদ্র গর্জনে। আমার মৃত্যুতেই আমার জন্ম! অকম্পিত আগ্রহ আর অবিচল শপথ—স্থির আলোকস্তম্ভ।

আমার নতুন জন্ম!

এগার

আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে যে ফাল্গুন এসেছিল রিক্ত গাছের শাখায়-শাখায় ফুল ফুটিয়ে আর উন্মাদনার ঢেউ জাগিয়ে পৃথিবীময়—বোধহয় একমাত্র আমিই তার খবর পাই নি। কেন? ফুলের মতোই একটা প্রশ্ন ফুটে ওঠে আমার মনের নিভৃতে।

কেন!

এই ফাল্গুন আসবে বলে—আমার তেইশ বছরের সব ব্যর্থ মধুমাস একসঙ্গে ঝলসে উঠবে বলেই আমি কোন কিছুর খণ্ড-খণ্ড রূপ দেখতে পাই নি। তাই নিজের চোখেই আমার এই উজ্জ্বল রূপান্তর আশ্চর্য লাগে। আমার মা-র চোখে তো লাগবেই।

আমি এখন ঘুম ভাঙার পরই আয়নার সামনে এসে দাঁড়াই। নিজেকে দেখি। আর মনে হয়, মা-র কথা মতো আমি কেন কৈশোরের প্রথম থেকে প্রসাধনে যত্ন নিলাম না! কেন কোন অলৌকিক কৌশলে আমি এই মুহূর্তে অসামান্য রূপের অধিকারিনী হতে পারি না!

যদিও তার কোন প্রয়োজন নেই। রূপে আমি ভোলাতে চাই না কাউকে। কিন্তু এই ফাল্গুনের হালকা হলুদ আলোয় এমন কিছুই আমি চাই যার কোন প্রয়োজন নেই সংসারে। দম্ভের পুরু একটা রেখা আমার মনে দাগ রেখে যায়।

এমন একটা কিছু আমার চাই যা এই পৃথিবীতে আর কারুর নেই। আশ্চর্য এক ক্ষমতা—অদ্ভুত এক শক্তি যা শুধু আমারই থাকবে। নিজের সম্পর্কে এই সচেতনতা আজকাল নিজের কাছেই আমার মূল্য অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর মনে হয়, আমাদের পত্রিকার নাম সনৎ যদি 'শ্রীমতী' দেয়—দিক। এখন আমি আপত্তি করব না।

মারও একটা আশ্চর্য পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করি। নিজের পত্রিকার ব্যাপারে তাঁর সব উৎসাহ যেন নিভে গেছে। তিনি যান বটে এখনও এখানে-ওখানে, চিঠি লিখে কিম্বা টেলিফোনে একে-ওকে লেখার তাগাদাও যেন—কিন্তু সব কিছুই তিনি যেন করেন বিকল একটা যন্ত্রের মতো।

ভয়ে-ভয়ে মাঝে মাঝে বাবা জিজ্ঞেস করেন মাকে, কি হল তোমার? আর্ন্‌'ট ইউ ফিলিং ভেরি ওয়েল?

কোন উত্তর দেন না মা। আর বাবা যখন দ্বিতীয়বার সেই এক প্রশ্নই করেন তখন তাঁর কর্কশ স্বর বেজে ওঠে, আমাকে অনেক দিনের জন্যে তুমি কোথাও পাঠিয়ে দিতে পার?

বিস্মিত দৃষ্টিতে মা-র দিকে তাকিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করেন, কোথায়? তুমি কোথায় যেতে চাও সরমা?

চুলোয় কিম্বা নরকে। রাস্তা জান নাকি তুমি?

বাবা তাড়াতাড়ি পাইপ ধরান। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়েন। আমার সামনে বোধহয় মা-র কথা শুনে লজ্জাও পান। কিন্তু তিনি মুখ বুজে থাকলেও মা থাকেন না। হয়তো আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়েই কথা বলে যান। বলুন। মা-র ওপর আজকাল আমার একটুও আক্রোশ নেই।

আমি যা করব তাই খারাপ, ফুলদানে ফুল সাজাতে-সাজাতে মা এক সুরে বলে যান, আমি লিখি, কাগজ বের করি, পার্টি দি—আমার কোন কাজই কারুর ভাল লাগে না—

মা, আমি বাধা দিয়ে বলি, ভাসটা একটু সরিয়ে রাখ। এখুনি পড়ে ভেঙে যাবে।

যায় যাক, ইচ্ছে করেই জোরে ফুলদানিটা মাটিতে আছড়ে ফেলেন মা। আর ফুলগুলো পায়ে মাড়িয়ে এ ঘর থেকে চলে যান। যাবার সময় একবারও ফিরেও তাকান না কারুর দিকে।

কি হয়েছে রে? আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করেন, তুই তর্ক-টর্ক করেছিস নাকি?

আমি মুখ নামিয়ে বললাম, না। আমি আজকাল আর মা-র সঙ্গে একেবারেই তর্ক করি না।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাবা শুধু বলেন, আই সী। কিন্তু ব্যাপারটা কি হল তাহলে?

আমি তো কিছুই জানি না।

বাবা আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না আমাকে। আমিও তাঁকে একা থাকবার সুযোগ দিয়ে সে-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একবার মাকে খুঁজি—কিন্তু তিনি কোথাও নেই। আজকাল রোজ সকালে নিয়ম করে তিনি দোতলার বারান্দায় লিখতেও যান না।

যদিও আমি বাবাকে বললাম যে মা-র কি হয়েছে আমি জানি না তবুও আমি যেন অল্প-অল্প মা-র মনের অবস্থা অনুভব করতে পারি। যত কঠিন স্বরেই তিনি কথা বলুন না কেন, তাঁর বুকে যে বেদনার তরঙ্গ ফুলে ওঠে, আমি যেন তার আভাস পাই।

শুধু মাকে নয়, কাউকেই কোন কারণে আক্রমণ করতে আমার আর ইচ্ছে করে না। প্রগাঢ় অনুকম্পায় প্রত্যেক মানুষের রূপ আমার চোখে আজ অন্য রকম লাগে। আর হয়তো আমার মনের এই পরিবর্তন মা-র কাছেও গোপন নেই।

আজকাল যখন বাড়িতে অনেক লোক আসে তখন মা না ডাকতেই আমি তাদের মধ্যে যাই। অকারণে হাসি, অবাস্তর কথা বলি। আর বোধহয় আমার হাসি কিম্বা কথার কোন অর্থই মা খুঁজে পান না।

কিন্তু কি যন্ত্রণায় উগ্র কাঠিন্যের রেখা পড়েছে মা-র চোখে-মুখে? কি বেদনায় যন্ত্রের মতো তিনি ছটফট করেন? আর কেন কথায়-

কথায় আক্রমণ করতে চান আমাকে ? মা-র চলা-ফেরার অর্থ আমি গভীর সমবেদনায় বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি।

কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারি যে সনতের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা তিনি আন্দাজে ধরে নেন। আর আমার সাংঘাতিক পরিবর্তনের সে-ই যে উপলক্ষ সে কথাটাও বোঝেন। আমার কাছে সনতের মূল্য কতখানি তা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও, আমরা যে তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা করি, মনে মনে নিশ্চয়ই তিনি তা কল্পনা করেন।

কিন্তু কি সে আলোচনা ?

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই মা-র মাথা খারাপ হয়ে যায়। বিনা প্রতিবাদে তিনি ইচ্ছেমতো কাজ করে যাচ্ছিলেন—নিজের দম্ভে নিজেই ছিলেন বিভোর। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে নি। কেউ জেরা করে নি। কোন কৈফিয়ৎও চায় নি কেউ।

আর এখন ?

আমি তাঁকে লক্ষ্য করি বলেই তিনি দিশা হারান। আর বোধহয় সনতের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছেন সবচেয়ে বড় আঘাত। হ্যাঁ, তার কাছে তিনি যেন ধরা পড়ে গেছেন। সে আর একেবারেই আসে না এ বাড়িতে। ফোন বাজলেই মা ছুটে ছুটে যান, মনে করেন সনৎ বুঝি ডাকছে আমাকে। কিন্তু কখনও টেলিফোন করে না সনৎ।

সনৎ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে বলে তিনি আমাকেই দায়ী করেন। আর সুযোগ পেলেই আমাকে দু-কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েন না। যদিও তিনি জানেন যে তার কথা শুনে আমি আর জ্বলে উঠব না—তাঁকে কোন উত্তরও দেব না।

আর বাবার ওপর তাঁর রাগ আজকাল হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে। সব ভুলে, আমারই সামনে তাঁকে তিনি সকাল-বিকেল কঠিন কথা শুনিয়ে দেন। বাবা শুধু মাথা তুলে ম্লান চোখে

তাকান তাঁর দিকে। কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনে যান।

একটা ভাল চাকরি করলেই আর একজনকে চিরকাল কিনে রাখা যায় না, হুম হুম পা ফেলে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে ঘোরা-ঘুরি করতে করতে আপন মনেই যেন মা বলেন, এ বাড়িতে আর যারা থাকে তাদের মন বলে যে একটা পদার্থ আছে সে-খবর রাখে কি কেউ?

বাবা একেবারে চুপ। পকেট হাতড়ে লাইটার খুঁজে পান না। টেবিলের ওপর দেশলাইও নেই। আমি উঠে গিয়ে একটা দেশলাই এনে রাখি বাবার সামনে। তিনি কিন্তু পাইপটা নিয়ে নাড়াচাড়াই করেন। ধরাবার সাহস পান না।

কে চায় এখানে থাকতে? মা বলে চলেন, শুধু নিয়ম আর নিয়ম। সেই একই ধরনের মানুষের সঙ্গে বোকা-বোকা কথা বলা। এ বাড়িতে থেকে কাগজ চালানো—হঠাৎ খিলখিল করে মা হেসে ওঠেন, একদিন আমি আগুন লাগিয়ে দেব—যত পত্রিকা বেরিয়েছে সব পুড়িয়ে দেব—কলম ছুঁড়ে ফেলে দেব রাস্তায়—

এখন মাকে মনে মনে আর ছোট করে দেখতে পারি না আমি। তাঁর ওপর করুণা জাগে আমার। ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি যেন। জ্বলে যাচ্ছেন—শেষ হয়ে যাচ্ছেন। তবুও কোন কথা বলবার উপায় নেই আমার। আমি কিছু বলতে গেলেই তিনি মনে করবেন যে আমি তাঁকে বিদ্রূপ করছি আর কঠিন স্বরে আমাকে থামিয়ে দেবেন।

কারুর সামনে আমি আর যেতে পারব না, মা গলার স্বর আরও তোলেন, কিছু করতে পারব না এ সংসারের জন্যে। কেন, আর কি লোক নেই এ বাড়িতে? দিন রাত তার সেজেগুজে শুধু রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেই চলবে? অন্ধ—অন্ধ এ বাড়ির সব লোক। পৃথিবী রসাতলে চলে গেলেও কারুর খেয়াল থাকবে না—

আমাকে লক্ষ্য করে মা এ কথাগুলো বললেও, তিনি সংসারের

কোন কাজই আজকাল আমাকে করতে দেন না। বাবার অফিসে লাঞ্চ পাঠাবার সময় তিনি নেমে আসেন খাবার ঘরে। আমাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ঠিক করে দেন সব। আর বাবার বন্ধুবান্ধব এলে আমি যদি হাসিমুখে তাঁদের সামনে দাঁড়াই তাহলে মা রূঢ় ভাষায় আমাকে সেখান থেকেও সরিয়ে দেন।

কিন্তু আর একজন যে এ বাড়িতে আসা একেবারে বন্ধ করেছে— যার সঙ্গে মা-র দেখাও হয় না—আমরা কেউই উচ্চারণ করি না তার নাম তবু আশ্চর্য এক প্রভাব যেন সনৎ ছড়িয়ে গেছে প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে দেয়ালে। মার মনের দ্বন্দ্ব—আমার পরিবর্তন— বাড়ির প্রচণ্ড ওলট-পালটের মধ্যে প্রধান হয়ে আছে তারই প্রভাব। সে কথা মা আর আমি দুজনে মনে মনে খুব ভাল করেই বুঝতে পারি।

আমি ইচ্ছে করেই সনতের কথা এখন তুলি না। আর ভাবি, যদি কখনও মা তার প্রসঙ্গ তোলেন তাহলে কেমন অবস্থা হবে আমার! এখন ওকে নিয়ে কি আব আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে পারব! না। কিছুতেই না।

তবে তার কথা খুব শিগগিরই আবার উঠবে এ বাড়িতে শেষ-বারের মতো। এখান থেকে আমার যাবার আগে-আগে তার নাম বলতেই হবে—তার কথা তুলতেই হবে। আর তখন? মা কি বলবেন? বাবার চেহারাটা কেমন দেখাবে?

আর খুব বেশি দেরি নেই। চঞ্চল ফাল্গুন শেষ হয়ে যাবে। চৈত্রের হু-হু হাওয়ায় পাতা ঝরে পড়বে অনেক। তারপরই আসবে রুদ্র বৈশাখ সাধনার ধ্যানমূর্তি নিয়ে।

বৈশাখেই প্রকাশিত হবে আমাদের পত্রিকা। আর কেন জানি না, এ মাসটাই সনৎ বেছে নিয়েছে সব কিছু নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে। কিন্তু মা-বাবাকে সে কথা জানাবে কে? আমিই। কিন্তু কেমন করে? কোন্ কথা দিয়ে আমি শুরু করব!

দরকার কি আগে থেকে জানাবার ? একদিন বলেছিল সনৎ, পরে একটা চিঠি লিখে দিলেই তো হয় ?

হেসে বলেছিলাম, কিন্তু আমি যে সংগ্রাম চাই।

যদি হেরে যাও ?

তুমি জিতিয়ে দেবে।

কেমন করে ? আমার তো ওখানে যাওয়া বারণ—

কিন্তু যদি ওঁরা আমাকে বেঁধে একটা অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখেন--সকলের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন আর তোমাকে দেখলেই গুলি করতে আসেন তখন কি করবে তুমি ?

জোরে হেসে সনৎ বলেছিল, ইচ্ছে করেই বুক পেতে দেব বন্দুকের মুখে। তোমার জন্যে মরতে পেরে ধন্য হব—কৃতার্থ হব।

আমি তার কথা শুনে বলেছিলাম, কিন্তু আমি তোমার জন্যে বাঁচতে চাই—মরতে চাই না।

তবে আমিও বাঁচতে চাই।

তাহলে মরবার কথা বল কেন ?

তোমাকে পেয়ে আমার কাছে বাঁচা-মরা এক হয়ে গেছে বলে।

শুধু আবেগ—তোমার আর কিছু নেই দেখছি।

আমার অনেক কিছু আছে শ্রীমতী—অনেক কিছু ! জন্ম-জন্ম ধরে তুমি তার ভাগ পাবে।

দেখা যাবে।

বৈশাখ আসবার আগে-আগে আমিই মাকে জানাব সনতের সঙ্গে আমার পাকাপাকি সম্পর্কের কথা। প্রচণ্ড বাধা এলেও আমাকে বলতেই হবে। একটি-একটি করে অতিক্রম করে যেতে হবে বাধার পাহাড়। ভীরুর মতো আমার সত্যকে গোপন করে আমি এড়িয়ে যাব না কঠিন সংগ্রাম। বাধা আছে বলেই তো এত আনন্দ ! কঠিন বলেই তো তৃপ্তির অপূর্ব স্বাদ !

আমি বৈশাখের প্রতীক্ষা করি।

বারো

চৈত্রের শেষাশেষি এ কদিন ঝড়ের সঙ্কেত ছিল না কোনখানে। চারপাশে উগ্র কঠোর এক দাহ! পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মিথ্যার রঙীন জাল। কিন্তু অসামান্য সহ্যশক্তি নিয়ে টিকে থাকবে আরও কঠোর এক সত্য—গাঢ় গৈরিক উত্তরীয় সম্বল সন্ন্যাসীর মতো।

আমার মা-র মুখেও কোমলতার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু তিনি নিজেই যেন জ্বলে যাচ্ছেন। তাঁর চোখ জ্বলছে। শরীর জ্বলছে। মন জ্বলছে। এক-একবার ইচ্ছে হয়, তাঁর বুকে মাথা রেখে ছেলেবেলার মতো জিজ্ঞেস করি, ওমা, তুমি কেন এমন করে জ্বলে-জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছ?

কিন্তু তাহলে চিৎকার করে উঠবেন আমার মা। আমাকে সহ্য করতে পারবেন না। সামনে থেকে হয়তো সরে যেতে বলবেন। তাই ইচ্ছে হলেও আমি মাকে সান্ত্বনা দিতে পারি না। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবার সাহস আমার হয় না।

একদিন পড়ন্ত বিকেলের আলো যখন ছড়িয়ে পড়ল সাদা দীর্ঘ দীর্ঘ গাছের মাথায় আর অপূর্ব রঙের প্রশস্ত এক রেখা স্থির হয়ে রইল ঘোরানো বারান্দার একদিকে—ঠিক তখন আস্তে আস্তে পা ফেলে মা এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে।

গম্ভীর ভারী একটা ডাক, খুকি!

নম্র স্বরে বললাম, কি মা?

আমার পত্রিকা আমি বন্ধ করে দেব।

কেন?

আমার ভাল লাগে না, হঠাৎ মা-র গলার স্বর বড় করুণ মনে হল। ভিজে-ভিজে নরম।

তবু আমি বললাম, কিন্তু বৈশাখ মাস থেকে আমরা—

না! যেন গম্ভীর এক আদেশ, আমাকে কথা দে খুকি যে তুই এসবের মধ্যে যাবি না?

কিন্তু কেন তুমি আমাকে বারণ করছ মা?

কৈফিয়ৎ?

আমি অমনি জিজ্ঞেস করছি।

কোন বিষয়ে মা-র প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হয় না, বোধহয় এক মুহূর্তের জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন মা, যে তোর মাথায় এসব ঢুকিয়েছে সে একটা বাজে লোক—একটা ভ্যাগাবণ্ড—

তাকে তুমি শুধু শুধু দোষ দিচ্ছ মা।

নিশ্চয়ই দেব। কী ভেবেছে সে? তোর মতো মেয়ের সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে কাগজ বের করবে!

আমার নাম থাকবে না।

না থাক। তার সঙ্গে গলা ধরাধরি করে ছত্রিশ জায়গায় ঘুরে বেড়াবার কি দরকার তোর?

কাকে ধিক্কার দিলাম জানি না। মা-র ভাষা শুনে আমার বুক ঠেলে যেন আর্তনাদ বেরিয়ে এল, মা!

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব জানি, প্রতিহিংসার আগুন ঝলসাল মা-র হিংস্র চোখ দুটোয়, ওই একটা অপদার্থ বেকারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রায়ই বিকেলে তুই সেজেগুজে বেরিয়ে যাস—

হ্যাঁ যাই।

কিন্তু কেন? একটু লজ্জা করে না তোর?

না।

আমার হাতের ওপর মা-র শরীরটা যেন ভেঙে পড়ল, খুকি, আমার একটা কথা শোন—তুই ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিস না।

তা হয় না মা!

স্বপ্নঘোরে যেন আমি কথা বললাম। সময় হয়েছে। মা যখন

নিজেই প্রথম কথা তুললেন তখন আমি আজই তাঁকে আমাদের সম্পর্কে সব কথা জানিয়ে দেব।

কেন হয় না? একটা করুণ অনুনয় কাঁপল, আমার ওপর রেগেই তুই তো এই কাণ্ডটা করলি—বেশ, আমি হার মানছি। মা হয়ে আমি সব অন্যায় স্বীকার করছি তোর কাছে—

এসব কথা কেন বলছ মা? তোমার জন্যে কিছুই হয় নি—কিছুই হত না—কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। স্বর কাঁপবে। মুখে আভা ফুটে উঠবে। তবু অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম, যদি কিছু হয়ে থাকে তা আমার জন্যেই হয়েছে—আমাদের জন্যেই হয়েছে।

এবার আর্তনাদ করে ওঠার পালা মা-র, কি হয়েছে—বল শিগগির কী হয়েছে? খুকি!

বৈশাখ মাসে আমরা—

আলোর প্রশস্ত রেখাটা এখন অল্প-অল্প কাঁপছে। আর একটু পরেই মুছে যাবে। আর তখন সনৎ পৌঁছে যাবে লেকের সেই জায়গায়। এখন কটা বাজল? হয়তো এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে এখন আমাকেই খুঁজছে।

দেয়ালে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে ভয়ঙ্কর হাসি হেসে উঠলেন মা, তুই পাগল! যা কখনও হয় নি, তা হতে পারে না। সে-বৈশাখ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কখনও আসে নি—আসবে না—আসতে পারে না!

আমি যেন আমার হৃদয় মেলে ধরলাম মা-র সামনে, আসবেই!

না না! আমি আসতে দেব না!

কাকে তুমি আসতে দেবে না মা?

খুকি, একটা মজা দেখবি?

কি?

আমি যত লেখা লিখেছি এ জীবনে আর পত্রিকার যে কটা সংখ্যা

বের করেছি এক মাসে—তোর সামনে এখুনি আমি আগুন ধরিয়ে দিতে পারি ?

কিন্তু কেন তুমি তা করবে ?

ওরে বোকা মেয়ে, তোকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে তোর চেয়ে বড় আমার কাছে আর কিছু নয়।

মা এমন করছেন কেন ? কেন তাঁর সব দম্ভ ভেঙে গেল—হারিয়ে গেল ! আমাকে ফেরাবার জন্য কেন তাঁর এই ব্যর্থ করুণ চেষ্টা ! আমি ফিরতে পারি না—আমি থামতে পারি না—সে কথা ভাষার কোন্ ইন্দ্রজালে তাঁর কাছে স্পষ্ট করে তুলব !

না, ভাষা নেই আমার। চুপ করে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। মেঝেতে লুটিয়ে পড়া পড়ন্ত বিকেলের আলোর রেখা মিলিয়ে গেছে। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। বড় দেরি হয়ে গেছে। আমাকে এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে সনৎ হয়তো ফিরে যাবে।

কোথায় যাচ্ছিস ? ঘুরে এসে মা আমার সামনে দাঁড়ালেন।

একটু কাজ আছে—

না, কোন কাজ নেই। চল, আজ আমরা দুজন অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে যাই।

আর একদিন যাব। আজ থাক।

না, আজই। আমাকে একা ফেলে রোজ রোজ এমন করে তুই কোথায় চলে যাস ?

কেন মা আজ এমন করে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছেন ? আমি যে আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। এখুনি সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে আমার। কি কথা বলব আমি মাকে ?

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা বললেন, তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস না—একটু দাঁড়া—দেখ, তোর জন্যে এখুনি আমি কী করতে পারি !

দ্রুত পায়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন মা। আর নিষ্প্রাণ একটা পুতুলের মতো আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মা কি করেন না করেন জানবার জন্যে কোন উৎসাহ আমার নেই। একবার ভাবলাম, এখন কেউ কোথাও নেই—আমি এই ফাঁকে এখান থেকে সরে যাই।

কিন্তু মা ফিরে এলেন। তাঁর হাতে অনেক ভারী-ভারী পত্রিকা, কাগজ আর ফাইল। তাঁর লেখার টেবিলের ওপর সেগুলো রাখলেন তিনি। মুহূর্তের জন্যে তাঁর চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠল। ছলোছলো দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে নিলেন তিনি একবার। আমাকেও দেখলেন। তারপর দুই হাতে সেই কাগজ আর পত্রিকা-গুলো ছিঁড়তে লাগলেন। শুধু খর্‌খর কর্কশ শব্দ।

মা! তাঁর হাত ধরে আমি তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলাম, এ তুমি কী করছ মা!

কোন বাধা মানলেন না মা। আমাকে সরিয়ে দিলেন। আরও দ্রুত হাত চলতে লাগল তাঁর। ছেঁড়া কাগজের স্তূপ জমে উঠল টেবিলের ওপর। আর মা-র চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল।

হঠাৎ ভারী কান্নায় তিনি ভেঙে পড়লেন টেবিলের ওপর। তাঁর দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে শুধু। আমি সাবধানে তাঁর পিঠের ওপর একটা হাত রাখলাম। সান্ত্বনার দু-একটা কথা বলতে চাই তাঁকে। কিন্তু কি বলব! আমি যে এখনও বুঝতে পারছি না কেন তাঁর এই আকাশ-ভাঙা কান্না!

কেন!

তেরো

হয়তো এই কান্না দিয়ে মা আমাকেও কাঁদাতে পারতেন। এ বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট ভিজে উঠত আমার চোখের জলে। যাবার বেলায় বারবার আমি পিছন ফিরে তাকাতাম। শিশির-সিক্ত হয়ে উঠত আমার পদক্ষেপ। অনেক কঠিন হত আমার যাত্রা।

বেদনার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে সনৎ বলল, কি হয়েছে আজ তোমার শ্রীমতী ?

আমি সনতের আরও কাছে সরে এলাম। কথা বলতে পারলাম না। আবছা আলোয় অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা গাছ। লেকের টলোমলো জলে শুধু বেদনার একটা করুণ সুর বাজছে। কিন্তু কেন আমার এ উচ্ছ্বাস !

কি হয়েছে ?

বৈশাখ মাস আসতে আর কত দেরি সনৎ ?

আর ঠিক পাঁচ দিন।

মা আজ খুব কাঁদছিলেন—

ভয়ে ভয়ে সনৎ জিজ্ঞেস করল, কেন ?

জানি না। আমি কিছু বুঝতে পারি নি। তবে বোধহয় আমারই জন্যে কাঁদছিলেন।

বিব্রত সনৎ বলল, কি হয়েছে তোমার ?

কি বলব ? আমি যে নিজেই জানি না কী হয়েছে আমার। মা-র কান্নার কারণও আমার জানা নেই। তবে বেদনার মধুর একটা স্বাদ আজ সকলকে নতুন করে তুলছে আমার চোখে। ভাল লাগাচ্ছে। আমার পাশে যে বসে আছে সেই মানুষটিও গভীর আর এক রূপ নিয়ে যেন বিকশিত হয়ে উঠেছে শেষ চৈত্রের প্রথম হালকা অন্ধকারে।

আমার কিছু হয় নি, চাপা স্বরে থেমে থেমে বললাম, কিন্তু মা-র অন্য আর এক রূপ আমি দেখেছি।

কি ?

তাঁর যত লেখা—সম্পাদিত যত পত্রিকা আজ আমার সামনে টুকরো-টুকরো করে তিনি ছিঁড়ে ফেললেন।

বিচলিত হয়ে সনৎ বলল, কেন ?

ঠিক জানি না, আমি সনতের কাছে সহজ হবার চেষ্টা করে বললাম, হয়তো আমারই জন্যে।

তোমার জন্যে ?

হ্যাঁ, মা-র ধারণা যে তাঁর কাজের প্রতিবাদ করবার জন্যেই আমরা পত্রিকা বের করছি, একটু থেমে বললাম, আর তিনি তোমাকে ঠকিয়েছেন বলে ক্ষতিপূরণের জন্যেই তুমি ফুটে উঠেছ আমার জীবনে।

যেন গুঞ্জন করে উঠল সনৎ, সে কথা তো মিথ্যা নয় শ্রীমতী।

মিথ্যা সনৎ! থমথমে ভারী স্বরে বললাম, একেবারে মিথ্যা। তোমার আর আমার সম্পর্কের মাঝখানে আজ বোধহয় লাভ-ক্ষয়-ক্ষতি কিছু নেই।

আমার নাম ধরে শুধু ডাকল সনৎ, শ্রীমতী! তারপর গভীর স্বরে আমাকে শোনাল, না, কিছু নেই!

একদিন হয়তো ছিল, কোন পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি যেন কথা বলতে লাগলাম, কিন্তু যদি কিছু থেকে থাকে প্রথম-প্রথম—যত জ্বালা আর আক্রোশ হিংসা আর যন্ত্রণা—তুমি বিশ্বাস কর, আজ আর কিছু নেই।

হাসির বিদ্যুৎ-আভা খেলল সনতের ঠোঁটে, আমার কোনদিনও কিছু ছিল না শ্রীমতী। সবদিক থেকেই আমি একেবারে নিঃস্ব—

ওকে বাধা দিলাম, তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি মহৎ।

মহত্ত্বের সব বিদ্যা তুমিই আমাকে শিখিয়েছ শ্রীমতী! স্বর যেন রুদ্ধ হয়ে যাবে সনতের, কিন্তু কি দিলাম তোমাকে আমি!

তার কোন নাম নেই, ওর একটা হাত সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে বললাম, তুমি আমাকে দুঃখ দিতে পার সনৎ? ভয়ঙ্কর কঠিন আঘাত দিতে পার?

শ্রীমতী!

আমি আমার মা-বাবার কাছে যত দুঃখ আর আঘাত পেয়েছি তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি—

শ্রীমতী!

তোমার দেয়া দুঃখ আর আঘাতে আমার মনে যত মরচে পড়া হীরে আর মণি-মুক্তো আছে, সব একসঙ্গে প্রখর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। তোমাকে আমি আরও অনেক বেশি ভালবাসতে চাই। অনেক বেশি—

খুকি!

বিকট এক গর্জনে আমার কথার উৎস শুকিয়ে গেল। সনৎ উঠে দাঁড়িয়েছে। আমিও চমকে ফিরে তাকালাম। মা এসে দাঁড়িয়েছেন ঠিক আমাদের পিছনে। গ্রীষ্মের বিক্রম অগ্রাহ্য করে তিনি ঠক ঠক করে কাঁপছেন। রুক্ষ কঠিন ভয়ঙ্কর এক মূর্তি। একটু দূরে আমাদের বড় গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। কারুর মুখেই কথা নেই।

সনৎ!

বলুন?

তুমি ভেবেছ কী! এমন খোলামেলা জায়গায় হাজার লোকের ভিড়ে আমার মেয়ের সঙ্গে প্রলাপ বকতে তোমার একটু লজ্জা করে না?

মা! প্রলাপ সনৎ বকে নি। আমিই কথা বলছিলাম।

তিনি আমার কথা শুনলেন না। দু-এক পা এগিয়ে এসে সনতের সামনাসামনি দাঁড়ালেন, জান, আমি তোমাকে পুলিশে দিতে পারি?

না, বিনয়ে যেন গলে গেল সনৎ, আপনি পারেন না।

আমি কি পারি না পারি তুমি তার কি জান?

আমি চারপাশে তাকিয়ে নিলাম। যদিও এখন এদিকে কেউ নেই। কিন্তু দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে অনেক মানুষ। আর কিছুক্ষণ এখানে কথা কাটাকাটি চললেই ভিড় জমে যাবে।

মা কিছু মানবেন না—কিছু শুনবেন না—অসংখ্য লোকের সামনে সনৎকে তিনি অপমান করে যাবেন।

ও মা, তুমি থাম। এখানে এসব নিয়ে আলোচনা করো না।

সে কথা তোমার খেয়াল ছিল না? প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে মা আমাকে থামিয়ে দিলেন, এটা যে ঢলাঢলি করবার জায়গা নয়—তা বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার নেই—তুমি কি এতই ন্যাকা?

সবই যখন শুনেছেন, খুব আস্তে থেমে-থেমে সনৎ বলল, তখন আপনার অজানা আর কিছুই নেই—

আমি কিছু শুনি নি। আমি কিছু জানতে চাই না। তুমি চলে যাও এখান থেকে! আর কোনদিন আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এস না—

না, আমি ধৈর্য হারাই নি। আমি ঠিকই আছি। মা-র তীক্ষ্ণ উষ্ণ স্বর আমার কানে গেলেও কোন আঘাত বাজছে না মনে। আর আমি জানি, অপমানের লজ্জায় হিম হয়ে যাচ্ছে না সনতের দেহ। কিন্তু এবার কথা বলতেই হবে আমাকে।

কাকে কোথা থেকে তুমি চলে যেতে বলছ মা?

সে কথা তুমি বুঝতে পারছ না?

পারছি বলেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। প্রথম কথা, এটা কারুর বাড়ির একটা সাজানো ড্রয়িংরুম নয়। আর আমিই ওকে এখানে আসতে বলেছি—

আমি ওকে চলে যেতে বলছি!

না। ও যাবে না। তুমি ওকে চলে যেতে বলতে পার না!

পারি—পারি—একশোবার পারি। আমি তোমার মা।

কিন্তু তোমার মেয়ে—মুহূর্তের দ্বিধা জয় করে নিয়ে বললাম, শুধু সেটাই আজ আমার একমাত্র পরিচয় নয় মা।

খুকি! হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে মা সনৎকে জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা হলে তুমি আমাকে এ লজ্জা থেকে বাঁচাতে পার?

লজ্জা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বুঝতে পারছ না সনৎ আমার মেয়েকে তুমি কোথায় নামিয়ে নিয়ে চলেছ—বল কত টাকা তুমি চাও?

সনৎ হাসল, তত টাকা আপনাদের নেই।

আছে, মা ঘাসের ওপর চটির শব্দ করলেন, যেমন করে হোক তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব। বল, কত চাও?

আপনার মেয়ের কত দাম—সে কথা তো আপনিই ভাল জানেন।

আমি তোমার সঙ্গে রসিকতা করছি না সনৎ!

হ্যাঁ মা, তুমি তাই করছ, আমার ধৈর্যের বাঁধ বুঝি ভাঙে-ভাঙে, একটা কৃত্রিম জগৎকে টাকায়-টাকায় ঢেকে চিরদিন সাজিয়ে রাখা যায় না। ও কোটি টাকাও নেবে না তোমার কাছ থেকে।

তোরা ওই জলে ডুবে মরতে পারিস?

না। আমাদের কোন লজ্জা নেই।

মা চীৎকার করে উঠলেন, নির্লজ্জ!

আমি সনতের দিকে ফিরে বললাম, চল সনৎ।

কোথায় যাবি তোরা?

ওকে ট্রামে তুলে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাব।

মন্থর পায়ে আমরা এগিয়ে গেলাম রাস্তার দিকে। একবারও পিছন ফিরে দেখলাম না। আর কারুর পায়ের শব্দ নেই! মা বোধ হয় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই। আমাদের গতি রোধ করবার কোন ক্ষমতাই যেন তাঁর আর নেই।

ঘাসে-ঘাসে পা ফেলে আমরা চলতে লাগলাম।

চোদ্দ

সনৎকে ট্রামে তুলে দিয়ে আমি ইচ্ছে করেই অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। জানতাম, এখানেই মা থাকবেন না। এর পর যতদিন আমি ও বাড়িতে থাকব ততদিন তিনি আমার পাশে-পাশে ফিরবেন ছায়ার মতো। আমাকে সতর্ক করবেন—যুক্তি দিয়ে বোঝাবেন আমি যা করতে চলেছি তা কত বড় ভুল।

আর হয়তো প্রায়ই যাবেন সনতের সঙ্গে দেখা করতে। তাকে ভয় দেখাবেন। শাসন করবেন কিম্বা চোখের জল ফেলে তার মন ভেজাবার শেষ চেষ্টা করবেন।

এর মধ্যে একটা চাকরি পেয়েছে সনৎ। মেস ছেড়ে ওব বন্ধুর সঙ্গে একটা ফ্ল্যাটও ভাড়া নিয়েছে। আর আমিও 'শিগগিরই কাছাকাছি সরকারী কলেজে একটা কাজ পাব। তারপর বৈশাখেই আমাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

বেশ দেরি করেই বাড়ি ফিরে এলাম। মা-র যে-মূর্তি আজ দেখেছি সনতের সামনে তারপর আমার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে—তার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে না দেয়াই ভাল। বাড়িতে না ফিরতে পারলেই যেন খুশি হতাম।

যা হবেই—যা ঘটে গেছে আমার জীবনে, যুক্তি-তর্কের প্রবল ঝড়েও তা যে আর মুছে দেয়া যাবে না, সে কথা হয়তো সনতের সঙ্গে আমার মিলনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মা বুঝতে চাইবেন না। বাবাও নয়। কারণ মা যা বোঝাবেন, তিনি তাই বুঝবেন।

আজ কেউ আসে নি আমাদের বাড়িতে। আমাদের গাড়িগুলো ছাড়া আর কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। মা-বাবাও কোথাও আর বার হন নি। বারান্দার আলো জ্বলছে না। চারপাশে একটা থমথমে ভাব। মনে হল, দারোয়ানের মুখটাও যেন বিষণ্ণ।

কোন শব্দ না করে আমি এগিয়ে গেলাম। ড্রয়িংরুমে মা খুব জোরে-জোরে কথা বলছেন বাবার সঙ্গে। আমাকে দেখতে পেলেন। ভেবেছিলাম, ডাকবেন। কিন্তু মা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কথাও বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। আমি আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেলাম।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার। চারপাশ একেবারেই অচেনা লাগছে। আমার আপনার লোক এ বাড়িতে যেন একজনও নেই। আজই সনৎ কেন আমাকে নিয়ে গেল না তার সঙ্গে! কেন এক অজানা জায়গায় এমন করে আমাকে একা ফেলে গেল!

আলো জ্বাললাম না ঘরের। আমি কিছুক্ষণের জন্যে সকলের চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চাই। চৈত্র রাতের হাওয়া স্পর্শ করুক আমার দেহ। হাল্কা অন্ধকার মন ছুঁয়ে যাক। আমি কথা বলব না। আমার চৈতন্য লুপ্ত হয়ে যাক শুধু একটি মানুষের ভাবনায়। কোন অপমান—কোন আঘাত আমায় বিচলিত করবে না।

পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠে আসছে ওপরে। আমি হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলাম। তখন আলো অসহ্য মনে হল আমার। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। তবুও এক মুহূর্তের জন্যে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিলাম। কেন—আমি জানি না।

পাইপ কামড়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বাবা ডাকলেন, খুকি! মৃদু নরম ডাক। উনি ঘরের ভেতরে এলেন।

আমি জানি আজ আমার সঙ্গে কি কথা বলতে এসেছেন বাবা। আর কে তাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে তাও আমার অজানা নেই। সঙ্কোচের তুষার-ঝাপটায় প্রথম কিছুক্ষণ আমার দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলাম। বাবার সঙ্গে কেমন করে এসব কথা আলোচনা করব আমি!

ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল। ঘন ঘন পাইপ টানছেন

বাবা। কথা বলতে পারছেন না। মাঝে মাঝে বাইরে তাকাচ্ছেন। বোধহয় মা দাঁড়িয়ে আছেন কাছাকাছি কোথাও—ঠিক সময় এসে উপস্থিত হবেন।

আমি মাস দু-একের ছুটি নিয়েছি, জড়িয়ে-জড়িয়ে কথা বললেন বাবা, মুসুরি কিম্বা সিমলা যাব—বুঝলি ?

হ্যাঁ।

কোন্ কোন্ জায়গা তোর ভাল লাগে বল্ তো ?

সপ্রতিভ উত্তর দিলাম, আমার কলকাতাই সবচেয়ে ভাল লাগে।

কলকাতা! হা-হা করে বাবা হেসে উঠলেন, গুড গুড। কলকাতা এখন বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জায়গা—

তবুও কলকাতা আমার ভাল লাগে।

আই সী, ওপরে বনবন পাখার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, তা লাগুক। তবে কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে দেখবি এই কলকাতাই আরও অনেক বেশি ভাল লাগবে—

আমি এখন কোথাও যেতে পারব না বাবা।

কেন বল তো ?

লেকচারের কাজ পাচ্ছি শিগগিরই—

বাবা হেসে বললেন, কাজ করার কি দরকার তোর? ওসব পরে হবে। চল আগে কিছুদিন আমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসবি।

আর তা ছাড়া—মুখ নামালাম আমি। থেমে গেলাম।

কি ? বল খুকি ?

সনতের সঙ্গে একটা পত্রিকা বের করছি—

ওঃ নো! যেন একটা টিকটিকি ঝুপ করে পড়ল বাবার গায়ের ওপর, ওসব করে সময় নষ্ট করিস না। আজে-বাজে লোকের সঙ্গে বেশি মিশতে হয় না। আর সনৎ খুবই গরিব—

আমি সব জানি।

তাহলে কেন এমন বোকামি করছিস ?

বোকামি নয় বাবা—

তাহলে কি? একটা পুচকে ছোকরা—যার চাল-চুলো প্রেস্টিজ কিছু নেই—তুই তার সঙ্গে কোন বুদ্ধিতে—

প্রেস্টিজ! সোজাসুজি তাকালাম বাবার মুখের দিকে, তোমাদের প্রেস্টিজে আমার এক তিল বিশ্বাস নেই।

কিন্তু ওই একটা ভিখিরীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে কেমন করে তোর প্রবৃত্তি হবে খুকি?

হ্যাঁ, হবে।

না না না, আই কাণ্ট থিঙ্ক অব দ্যাট—

কিন্তু আমি পারি—আমি পেরেছি।

ওয়েল, খুকি—

এখন আমার আর কোন সঙ্কোচ নেই। যখন শুরু হয়েছে তখন শেষ হোক। আমি বাবার সামনেও মুখ খুলব। প্রয়োজন হলে আমি আজই চলে যাব এখান থেকে। প্রখর তেজ জ্বলছে আমার শিরায়-শিরায়। মিথ্যা দম্ভ চুরমার করার প্রবল তেজ।

মা বাবাকে পাঠিয়েছেন আমাকে ভোলাবার জন্যে। ছোট মেয়ের মতো ওঁরা আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবেন কলকাতার বাইরে। তারপর দু-তিন মাসে ওঁদের মনের মতো করে গড়ে তুলবেন আমাকে। তেইশ বছর ধরে যা করতে পারেন নি—অল্প কয়েক মাসেই যেন তা পারবেন। কী করুণ পরিহাস এঁরা করছেন আমাদের সঙ্গে!

সেই তেজের দীপ্তিতেই কে যেন আমাকে দিয়ে হঠাৎ বলাল, আমি সনৎকে বিয়ে করব বাবা—

হোয়াট!

একটুও চমকালাম না আমি, মা-র মুখে তুমি তো সবই শুনেছ—

বাট হাউ কুড আই বিলিভ ? যে-বাবা মার সঙ্গে কখনও জোরে কথা বলতে সাহস পান না, আজ আমার সামনে তিনি যেন হিংস্র হয়ে উঠলেন—রাগে ফেটে পড়লেন।

আমি বললাম, মা তোমাকে যা বলেছেন সব সত্যি—

তুই তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখেছিস ?

হ্যাঁ।

আমাদের কথা ভেবেছিস ?

তাও ভেবেছি বাবা।

কি খাবি, কেমন করে থাকবি—জানিস ?

বলেছি তো, আমি সব জানি।

ফুল্! আরও জোর দিয়ে বাবা আর একবার বললেন, ফুল্! এসব পাগলামি করা চলবে না!

বাবা—

আই স্যাল ফিনিশ হিম!

ভাবলাম জোরে একবার হেসে উঠি। কিন্তু হাসলাম না। দৃঢ় স্বরে শুধু বললাম, তুমি একটা সনৎকে শেষ করতে পার কিন্তু হাজার হাজার সনৎ--

চমৎকার! আমাদের তুজনের মাঝখানে হঠাৎ যেন মা ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এটা স্টেজ নয় খুকি—

জানি। কিন্তু নাটক আমি করছি না—তোমরা করছ।

তুই ভেবেছিস কী! কারুর কথা শুনবি না? কাউকেই মানবি না ?

তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি মা।

কোন অবলম্বন আমার দরকার নেই এখন। আমি একাই সারারাত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কথা বলতে পারব। আমি হার মানব না। এ বাড়িটা ভেঙে পড়ুক। কোন লজ্জা নেই আমার। আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব। পৃথিবীর সব লোক দেখুক আমাকে।

মাকে আসতে দেখেই বাবা সরে গেছেন। কথা বলছেন না মা। শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু ছাই করে দেয়া কি এতই সহজ! কী বিপুল শক্তি ভর করেছে আমার দেহে মনে!

আজ বুদ্ধ মন্দিরে সারাক্ষণ ঘণ্টা বাজে কেন?

বুদ্ধ পূর্ণিমা কবে!

পনেরো

যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে যে জীবন আমি তারও নাগাল পেয়েছি। যুক্তি-তর্কের মধ্যে যে জীবন আমি তাও পেয়েছি। আমার প্রেমই আমার কর্ম। আমার কর্মই আমার মুক্তি। আমার কর্ম প্রেম মুক্তি—মূর্তি নিল একটি মানুষের মধ্যে।

আমি কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করিনি। উদভ্রান্তের মতো দিশা হারিয়ে সীমিত করিনি আমার পরিধি। আমার প্রত্যেক মুহূর্তের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সে-মানুষও যেন মিশে গেছে আমার সঙ্গে—এক হয়ে গেছে।

প্রথম যেদিন এসেছিল এ বাড়ির সব কিছুর বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদের মতো—সেদিন আমি কী দেখেছিলাম ওর মধ্যে! যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে যে জীবন সে-জীবন।

তার অন্য নাম—আমার প্রেম।

আর যেদিন শেষ এসেছিল নিভে যাওয়া এক আলোকস্তম্ভের মতো—সেদিন আমি কী দেখেছিলাম ওর মধ্যে! যুক্তি-তর্কের মধ্যে যে জীবন সে-জীবন।

তার অন্য নাম—আমার কর্ম। আমার সংগ্রাম।

আর যে-জীবন প্রখর অশ্বখুর-ধূলি উড়িয়ে অতিক্রম করে গেল অরণ্য পর্বত সমুদ্র মরুপ্রান্তর—সে-জীবন জ্বলছে আমার নতুন সংসারের আলোয় ছায়ায়।

তার অন্য নাম—আমার মুক্তি। আমার সংসার।

আমি প্রেমের শরণ নিলাম!
আমি সংগ্রামের শরণ নিলাম।
আমি সংসারের শরণ নিলাম!

লেখকের অন্যান্য বই :

অন্তনগর
দূরের মিছিল
মনে মনে
মুখর লণ্ডন
ছায়া মারীচ
নতুন বাসর
জনসম্রাট
সুধাসঙ্কেত
নীলকণ্ঠী
স্মরণচিহ্ন
অন্দরমহল
সোহো স্কোয়ার
অন্তরাল
পারাবার

কথাকলির অন্যান্য বই :

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার ৩॥৹

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
কস্তুরী-মৃগ ৪৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৈশালীর দিন ৩।৹

বারীন্দ্রনাথ দাশের
তুলারীবাঈ ৪৲

বিমল করের
মল্লিকা ৩৲

আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরলিপি ৪৲

সন্তোষকুমার দে-র
রক্ত গোলাপ (গল্প সংকলন) ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
জতুগৃহ (যন্ত্রস্থ)